বিখ্যাত
জলদস্যু-কাহিনী

বীরু চট্টোপাধ্যায়

অনূদিত ও সম্পাদিত

গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

শ্রীমান প্রদীপকুমার চট্টোপাধ্যায়

কল্যাণীয়েষু

লেখকের অন্যান্য বই

হরারস অফ্ ড্রাকুলা
বিখ্যাত ভৌতিক কাহিনী
মানুষখেকোর কবলে
তিনটি অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী
ডিকেন্স কিশোর অমনিবাস
সুন্দরীদের দ্বীপ
প্রভৃতি

কলিকাতা

এক

এটি হল সর্বাধুনিক একদল দস্যুর কাহিনী। জল দস্যু—একে বলা ঠিক হবে না। কেননা ঐ নামটা দিলে কোন অপরাধ কাহিনী মনে হবে। একে বরং বোম্বেটে কাহিনীই বলা সঙ্গত। অবশ্য এর পেছনে ছিল এক মহৎ উদ্দেশ্য। জাহাজ দখল হল অবশ্যই, কিন্তু লুট-পাট নরহত্যা কোনটাই এদের অভিপ্রেত ছিল না। ঘটনা ঘটেছে বিংশ শতাব্দীরই ষষ্ঠদশকে।

একদল চরম দুঃসাহসী মানুষ সমুদ্রের মধ্যে বিশাল এক যাত্রী বোঝাই জাহাজকে কিভাবে দখল করে প্রায় বারোদিন বেপাত্তা করে রেখেছিল তারই চাঞ্চল্যকর কাহিনী।

পেড্রো পেরেইরা নামক এক যুবকের জবানীতেই এই রোমহর্ষক ঘটনা বর্ণনা করবো। পর্তুগীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পেরেইরা, ব্রেজিলের সাওপাওলোতে নির্বাসিত হয়ে বসবাস করছিল। যে পঁচিশজন সশস্ত্র বিদ্রোহী মানুষ পর্তুগীজ লাকসারী লাইনার 'সান্টা মেরিয়া'কে সমুদ্র বুকে দখল করে নিয়েছিল তাদেরই একজন এই ছেলেটি। ওদের—নেতা ছিল ক্যাপ্টেন হেনরি মালটা গালভাও। ওরা উক্ত জাহাজকে তার ৩৬৮ জন নাবিক ৬০০ জন যাত্রী সহ ক্যারিবিয়ন থেকে ৩৮০০ মাইল দূরবর্তী ব্রাজিলের বিসাইফ বন্দর পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল—পাক্কা বারোদিন ধরে। ওদের খুঁজে বের করে ধরবার জন্য পাঁচটি দেশের নৌবহর এবং বহু প্লেন হুলুস্থুল করে চষে ফিরছিল অতলান্তিক মহাসাগর। তারা অবশ্য ওদের 'জলদস্যু' নামেই অভিহিত করেছিল।

এই বিদ্রোহীদল যখন তাদের উদ্দেশ্য সাধনে প্রায় সফল হতে চলেছে এমন সময় এক অদ্ভুত কারণে কি ভাবে তাদের প্রচেষ্টা

বানচাল হয়ে গেল তার চরম চাঞ্চল্যকর কাহিনী প্রকাশ করেছে এই পেড্রো পেরেইরা নামক অসম সাহসী যুবকটি। ওর জবানীতে এবার শোনা যাক :

—হুঁশিয়ার ম্যান। কফিনটা সম্বন্ধে খুব হুঁশিয়ার, আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, ওভাবে নিতে হয়? মৃতের প্রতিও কি আপনাদের সম্মানবোধ নেই? আমি ডাচ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কুরাকাও-এর রাজধানী উইল্যামষ্টাড-এর ডকে দাঁড়িয়েছিলাম এক কড়া রোদ্দুরভরা উত্তপ্ত বিকেলে। আমার সাদা টুপি কাল স্যুটের হাতায় শোক চিহ্নজ্ঞাপক একটি কালো কাপড়ের ব্যাণ্ড আটা ছিল। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ২০,৯০৬ টনের লাকসারী লাইনার জাহাজ 'সাণ্টা মারিয়া'।

কাছেই দাঁড়িয়ে দড়ি ধরে অপর প্রান্তে ক্রেনে ঝোলানো একটি কাঠের কফিন তুলছিল জাহাজে। আমি অত্যন্ত দুরু দুরু বক্ষে লক্ষ্য করছিলাম কিভাবে ওটা দড়িতে মারাত্মকভাবে এদিক ওদিক দুলছিল, বিপজ্জনকভাবে হেলেও পড়েছিল। ভীষণ ভয় হচ্ছিল হয়ত এক্ষুনি ঐ কাঠের কফিন বাক্সটা ছিটকে ডেকে আছড়ে পড়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে ভেতরকার বস্তু সমূহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে।

—পোর ওস সাণ্টজ, আস্তে, আস্তে ওটা তোল ম্যান, আমি পুনরায় চিৎকার করলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ এবার ঠিক আছে। আচ্ছা ভাই, ঐ কফিনটা জাহাজে কোথায় রাখা হবে জানো? বলে আমি ঐ নাবিককে একটা সিগারেট অফার করলাম।

—ডি ডকের পেছনে ঠাণ্ডা ঘর আছে তাতেই রাখা হবে, নাবিক সিগারেট ধরিয়ে বললে, সেখানেই খুব নিরাপদে এটা থাকবে, সেনর।

ধন্যবাদ জানিয়ে আমি জাহাজে ওঠবার জন্য গ্যাংওয়ের মুখে যেখানে যাত্রীদের লাইন হয়েছে সেখানে এগিয়ে গেলাম। ঐ লাইনের ছয়জনকে আমি চিনি এমন কি ঐ যে গগলস পরা হুইল চেয়ারে বসা রোগী যাত্রীটি ওকেও চিনি।

এই হুইল চেয়ারে বসা মানুষটি হলেন ক্যাপ্টেন গালভাও। তিনি সকলের অজ্ঞাতে আমার পানে চেয়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে মাথা নেড়ে নড করলেন। অপর পাঁচজন ইচ্ছে করেই আমার দিকে একবারও তাকালো না। বাইরের লোকের মনে হবে আমরা একে অপরের অপরিচিত যাত্রী মাত্র।

লাইন এগোতে এগোতে আমি এসে পড়লাম টেবিল চেয়ার নিয়ে বসা জাহাজের অফিসার দুজনের কাছে। ওরা জাহাজে আরোহণরত যাত্রীদের তালিকা চেক করছিল।

আপনার নাম, প্লিজ?

—অ্যানটোনিও কার্ভাল, আমি আমার টিকিট ও পাসপোর্ট এগিয়ে ধরলাম ওদের দিকে। ওরা পাসপোর্টটা খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো এটা যে জাল ওরা তা বুঝতে পারল না, এমনই নিখুঁত এই জালিয়াতী।

—ওহো সেনর কার্ভাল আপনিই তো একটা কফিন নিয়ে চলেছেন সঙ্গে? ওদের একজন প্রশ্ন করে।

আমি গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়লাম, হ্যাঁ। আমার বেচারা দিদির মৃতদেহ। মৃত্যুর পূর্বে দিদির শেষ অনুরোধ ছিল তার শবদেহ যেন স্বদেশ পর্তুগালে নিয়ে সমাধি দেওয়া হয়।

—আমার সমবেদনা গ্রহণ করুন সেনর, অত্যন্ত সহানুভূতিভরা কণ্ঠে একজন অফিসার বললে, ঠিক আছে আপনি জাহাজে উঠে যান।

জাহাজের ডেকে বহু যাত্রী রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ডকের কাজকর্ম দেখছিল। সেখানে উঠে নিম্নস্তরের সাধারণ স্যুটপরা কয়েকজন যাত্রীকে চিনতে পারলাম। এরা হল আমাদেরই কমরেড। এরা ইতিপূর্বে আগেকার বন্দর ভেনেজুয়েলার, লাগুয়াইরাতে উঠেছে—এই সান্টা মারিয়া জাহাজে।

ওদের মধ্যে একজন আমার কাছে এগিয়ে এল, হাতে একটি

সিগারেট। ওর ওর নাম ওয়ালভির আলভেস। ওর গালে একটা গভীর কাটা দাগ রয়েছে।

—আগুন, মানে দেশলাই আছে? বলে একচোখ নাচিয়ে একটু মুচকী হাসলো সে।

আমি আমার সিগারেট লাইটার এগিয়ে দিলাম। মনে মনে ওর ব্যবহারে খুবই চটে গেলাম। আমাদের প্রতি নির্দেশ ছিল কঠোরভাবে আমরা যেন পরস্পরের কাছাকাছি না হই বা আলাপ আলোচনা না করি।

আলভেস আমার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিকে আমলই দিল না। বললে, আপনার দিদি ঠিক মতো জাহাজে উঠেছে তো?

আমি গম্ভীরমুখেই সম্মতিসূচক মাথা নাড়লাম, কিন্তু মুখে কোন কথা বললাম না। আলভেস চোখের একটা অশ্লীল ভঙ্গী করে সহাস্যে বলে উঠল, বহু কুমারী মেয়ে চলেছে জাহাজে। আমেরিকান, স্প্যানিশ, আরও কত দেশের। উঃ খুব জমবে ফূর্তি।

আমি সেখান থেকে সরে গেলাম। আমরা ফূর্তি করবার জন্য জাহাজে উঠিনি। যেভাবে আলভেস নির্দেশ অমান্য করে চলেছে তাতে সমস্ত পরিকল্পনাটাকে না মজিয়ে দেয় ব্যাটা। ডেক ছেড়ে একজন ষ্টুয়ার্ডকে পেয়ে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলাম টুরিষ্ট ক্লাস কেবিনের পথ কোন দিকে।

কিছুক্ষণ বাদেই জাহাজ কাঁপিয়ে ভোঁ বেজে উঠল। আমি পোর্ট হোলের ফাঁকে বাইরে তাকালাম। আমরা ধীরে ধীরে ডক ছেড়ে চলেছি দেখলাম। ক্রমে বন্দরের সুদৃশ্য বাড়িঘর সমূহ পেছনে সরে গেল। জাহাজ ক্যারিবিয়ান সাগরের দিকে এগিয়ে চললো।

এ পর্যন্ত সবই ভাল 'সান্টা মেরিয়া' তার নির্দিষ্ট জলপথে চলেছে। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই, যদি সব দিক ঠিকঠাক চলে, তাহলে এ জাহাজের তথাকথিত পঁচিশজন 'যাত্রী' মাঝ সমুদ্রে একে দখল করে নিয়ে মুক্তির পথে আঘাত হানবে।

আমিও সেই পঁচিশ জনের একজন।

এ পরিকল্পনার শুরু হয়েছে মাস পাঁচেক আগে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের শেষে ভেনেজুয়েলা জেলার কারাকাস শহরে। ইরাবিয়ান রেভলিউসানরি ডিরেকেটরেট অফ লিবারেসন বা সংক্ষেপে ড্রিল (DRIL)-এর তিরিশজন সদস্যকে জমায়েত হতে আদেশ এল আমাদের কাছে : কোথায় জমাযেত? জমায়েত হবে আমাদের নেতা হেনরিক মাল্টা সালভাও-এর কাছে।

ড্রিলের সমস্ত সদস্য রক্তক্ষয়ী পর্তুগীজ ডিরেকটর অত্যাচারী অ্যানাটনিও সালাজারকে গদি ও ক্ষমতাচ্যুত করবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এবং এই আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা হলেন ক্যাপ্টেন গালভাও।

পর্তুগীজ সরকারের একজন ভূতপূর্ব সামরিক অফিসার ক্যাপ্টেন গালভাও একজন প্রখ্যাত শিকারী, স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক এবং নাট্যকারও বটেন। পার্লামেন্টের একজন সদস্য হিসাবে ১৯৫৮ সাল থেকেই তিনি দুর্নীতিপরায়ণ, স্বৈরাচারী সালাজারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। ফলে তিনি কারারুদ্ধ হন এবং অসুখের অছিলায় লিসবনের জেল হাসপাতালে ভর্তি হন। নারীর ছদ্মবেশে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গিয়ে তিনি আর্জেন্টি এমব্যাসীতে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করে অবশেষে ভেনেজুয়েলায় চলে আসেন।

পর্তুগীজ সিক্রেটপুলিশ তাদের চর এখানেও পাঠায় গালভাওকে অহোরাত্র নজরে রাখবার জন্য। কিন্তু তিনি এক বাড়িতে দুরাত্রির বেশী বাস না করে তাদের চোখে ধুলো দেন। তারপর একটি তৈরী করা গুজব ছাড়া হল যে গালভাও ক্যানসার রোগে মৃত্যুপথ যাত্রী হয়েছে। এমন কি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও এটা বিশ্বাস করেছিল, এবং সালাজার-এর চরেরাও একসময় এ সংবাদে আস্থা স্থাপন করে নজর রাখার কাজ ক্যানসেল করে দেশে ফিরে যায়।

এর পরই গালভাও তাঁর অপর ২৯ জন ড্রিল সদস্যকে ডেকে পাঠান।

ক্যারাকান শহরের কিছু দূরে অবস্থিত এক বাড়িতে জমায়েত সদস্যদের কাছে তিনি তাঁর পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করেন :

—পর্তুগালের বাইরে বিশ্বের বহুলোকই জানেন না বা খবর রাখেন না যে পর্তুগাল সুদীর্ঘ একত্রিশ বছর ধরে টানা শাসিত হয়ে আসছে রক্তাক্ত এক ডিক্টেটারসিপের দ্বারা। আমাদের পর্তুগীজ ভাইয়েরা বাইরের কোন সাহায্য ব্যতিরেকে দুর্ধর্ষ সালাজারের পুলিশ বাহিনীর ভয়ে বিদ্রোহ করতে আদৌ সাহস পাচ্ছে না অতএব আমরা সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো দেশের প্রকৃত শোচনীয় ঘটনার প্রতি। একবার যদি বিশ্বজনমত অনুকূলে আনা যায়, তখনি সারা পর্তুগাল মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে, এবং আফ্রিকার বড় দুটি উপনিবেশ অ্যাংগোলা আর মোজাম্বিকে অচিরেই বিদ্রোহ শুরু হয়ে যাবে।

গালভাও এরপর বিশদভাবে ব্যাখ্যা করলেন তার চমকপ্রদ ও নাটকীয় পরিকল্পনার কথা, যার দ্বারা নিমেষে সালাজারের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের কথা সারা বিশ্বে প্রচারিত হবে

—আমরা মাঝ সমুদ্রে 'সান্টা মেরিয়াকে' দখল করে নেব। তোমরা জানো পর্তুগালের কাছে এই সুবৃহৎ যাত্রীবাহী জাহাজটি একটি সবিশেষ গর্বের জিনিস। এ জাহাজ লিসবন থেকে রওনা দিয়ে ভেনেজুয়েলা, কারাকাও হয়ে যায় ফ্লোরিডা, সেখান থেকে পুনরায় ফিরে যায় লিসবন-এ। সাধারণত এই জাহাজ বহু ধনী মার্কিন টুরিষ্টদের বহন করে থাকে। যদি আমরা এই 'সান্টা মেরিয়া'কে দখল করে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলস্থিত অ্যাংগোলায় নিয়ে যেতে পারি, তাহলে এটা হবে সালাজারের কাল স্বরূপ আর এই বিদ্রোহই হবে ডিকটেটর সালাজারকে গদিচ্যুত করবার বিপ্লবের সিগনাল বিশেষ।

শুনে আমরা এই পরিকল্পনার প্রতি দারুণভাবে আকৃষ্ট হলাম সঙ্গে সঙ্গেই। পরবর্তী কয়মাস ভেনিজুয়েলার পার্বত্য প্রদেশের এক নির্জন ফার্মে আমাদের নিয়মিত ট্রেনিং পর্ব চললো।

ক্যাপ্টেন গালভাও বারবার একই কথার ওপর জোর দিচ্ছিলেন, যদি সম্ভবপর হয় তবে এই অভিযানে আদৌ রক্তপাত হতে দেওয়া হবে না। যথারীতি সালাজার সরকার আমাদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ আনবার ও দোষারোপ করবার চেষ্টা করবে। আমাদের সহজেই 'জলদস্যু' বলে চিহ্নিত করবার প্রচেষ্টা হবে। তাই একান্ত অনিবার্য পরিস্থিতি ছাড়া একটিও গুলি ছোঁড়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ রইলো।

নভেম্বর মাসে, তখনও আমাদের ট্রেনিং চলছে, নেমে এল সাংঘাতিক এক বিপর্যয়। একরাত্রে আমাদের দলের ছয়জন লোক ফার্ম থেকে অজ্ঞাতসারে বেরিয়ে চলে যায়। কাকোস গণিকালয়ে মত্তাবস্থায় মারামারির দায়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গ্রেপ্তার হয়। যখন তারা মুক্ত হয়ে ফিরে আসে ক্যাপ্টেন গালভাও আমাদের জুরী করে ওদের কোর্ট মার্শাল বিচার শুরু করেন।

—এটা আমাদের একটা সামরিক সংস্থা বিশেষ, গর্জন করে বলে যান গালভাও, অতএব আমরা প্রত্যেকে জানপ্রাণ কবুল করেও ডিসিপ্লিন মানবই মানব। এইসব নিম্ন মনোবৃত্তির লোক অনায়াসে আমাদের এই অভিযান ভণ্ডুল করে দিতে পারে।

ছয় জনের প্রতি এই দণ্ডাদেশ হল যে ওদের ফার্মেরই একটা ঘরে তালা দিয়ে রাখা হবে এবং আমাদের কার্যনির্বাহন্তে অর্থাৎ জাহাজ দখল কার্য শেষ করে ফিরে এলে তবে ওদের মুক্ত করা হবে। বারবার গালভাও ডিসিপ্লিনের গুরুত্বের ওপর কঠোরভাবে জোর দিয়ে যাচ্ছিলেন।

—'সাণ্টা মেরিয়ায়' উঠে আমাদের বিন্দুমাত্র কোন ভুল ত্রুটি করলে চলবে না। এই আদেশের সামান্য ভুল ত্রুটি হলে তার কোন ক্ষমা নেই। আমি তোমাদের আশ্বাস দিচ্ছি যে কোর্ট মার্শাল বিচারে যদি প্রয়োজন হয় তবে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত অবশ্যই দেব আমি।

আমরা অবশ্য সেদিন কল্পনাও করতে পারিনি যে গালভাওকে

সত্যি সত্যিই এই চরম হুঁশিয়ারী কার্যকর করতে হবে, আমাদের ঐতিহাসিক সমুদ্র অভিযান শেষ হবার পূর্বেই আমাদের মধ্যেকার একজনকে প্রকৃতই প্রাণ দিতে হবে তারই কমরেডের হাতে। আর তার মৃত্যুই আমাদের সমস্ত পরিকল্পনার মোড় ঘুরিয়ে দেবে।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী ক্যাপ্টেন গালভাও সহ আমরা সাতজন ভেনেজুয়েলা থেকে কারাকাও বন্দরে প্লেনে করে চলে এলাম। এব ছ'দিন বাদে ২১শে বাদবাকি আঠেরজন আমাদের দলীয় মানুষ যাত্রী হিসেবে সাণ্টা মারিয়ায় আরোহণ করে লাগুয়াইরা বন্দর থেকে এবং সেদিন বিকেলে উইলেমস্টাড থেকে আমরা সাতজন উঠে পড়লাম উপরোক্ত জাহাজে।

আমাদেব অভিযান শুরুর সময় স্থির ছিল বাত ১-৩০ মিনিটে। কাঁটায় কাঁটায় একটা দশ-এ আমি একটা স্পোর্টসার্ট, স্লাকস্ পরে ও পকেটে ৩৮ অটোমেটিক পিস্তল নিয়ে ডি-ডেক এব উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। একজন ক্রু আমায় দেখিয়ে দিল, সেই রেফ্রিজারেটেড স্টোররুমটি। করিডোরে একজন নাইট স্টুয়ার্ড ডিউটিতে ছিল।

জাহাজ চলেছে রাত্রির অন্ধকারে সমুদ্রের নোনাজল কেটে ফেনা ছড়িয়ে ঢেউ তুলে।

—পারসার। আমি তাকে বললাম, আমার দিদির কফিনটা বারেক দেখতে চাই।

উঠে দাঁড়িয়ে নাইট স্টুয়ার্ড খুবই সহানুভূতি পূর্ণ কণ্ঠে বললে, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই সেনব।

তাবপর সে স্টোররুমের লক খুলে দিল। দুজনেই আমরা ভেতরে ঢুকলাম। যেই সে ফিরে দাঁড়িয়েছে আমি পকেট থেকে পিস্তল তুলে তার বাঁট দিয়ে ওর মাথার পেছনে সজোরে আঘাত হানলাম। একটি শব্দ না করে স্টুয়ার্ড মাটিতে পড়ে গেল মূর্চ্ছিত হয়ে।

দু'সেকেণ্ড বাদে বন্ধ দরজায় নক্ হল। দরজা খুলে ক্যাপ্টেন গালভাওকে ভেতরে ঢোকালাম। তার পেছনে করিডোরে আমাদের বাদবাকি কমরেডরা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। অতিদ্রুত আমরা কফিনের ডালা চাড দিয়ে খুলে ফেললাম। ভেতরে কোন শবদেহ ছিল না। তার পরিবর্তে ছিল একপাঁজা টমিগান, বহু পিস্তল, গ্রেনেডসমূহ, রাইফেল ও গুলিগোলা।

আমার "মৃতা দিদি" হল এই সব বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র, যাদের সাহায্যে আমরা অচিরে সাণ্টামারিয়া জাহাজ দখল করে বসবো।

অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত আমরা বিভিন্ন স্কোয়াডে বিভক্ত হয়ে অর্থাৎ পূর্বপরিকল্পনামত এক এক দল এক একটি কার্যক্রমের ভার নিয়ে শুভকাজে এগিয়ে গেলাম। রেডিও অপারেটর নেলসন রিবেইরার নেতৃত্বে একটি গ্রুপ চলে গেল রেডিও রুমের দিকে। আরেক দল এগোলো ক্রুদের আবাসস্থলের পানে। তৃতীয় দল অগ্রসর হল ইঞ্জিনরুম উদ্দেশ্য করে।

আমাদের গ্রুপে ছিলেন ক্যাপ্টেন গালভাও, আর ওয়ালডির আলভেস ও অপর তিনজন। তার মধ্যে আমাদের নেভিগেটর জর্জ সাণ্টো মেয়রও ছিল। সেই-ই আমাদের দলে একমাত্র অ-পর্তুগীজ সদস্য ছিল। ওর বাড়ি স্পেনে। আগে ও ছিল একজন নৌ-অফিসার। স্পেনের গৃহযুদ্ধে লয়ালিস্টদের হয়ে লড়াইও করেছিল। ওরই কমাণ্ডে ডেষ্ট্রয়ার দিয়ে ফ্র্যাঙ্কোর জাহাজ বেলিয়ারেসকে ডুবিয়ে দিয়েছিল।

১-২৮ এ আমরা গিয়ে উপস্থিত হলাম ব্রীজ-এর সিড়ির কাছে। এক মিনিট বাদে হুড়মুড় করে গিয়ে প্রবেশ করলাম আমরা দরজা দিয়ে কেবিনে। ভেতরে দুজন উপস্থিত ছিল—একজন অফিসার ও একজন নাবিক ছিল হুইল-এ। তারা হতচকিত হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আমাদের হাতে অস্ত্র দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেল।

—এক পা নড়বার চেষ্টা করবে না। কঠোর কণ্ঠে গর্জে উঠলো

ক্যাপ্টেন গালভাও, আমরা এ জাহাজের সমস্ত কর্তৃত্ব নিয়ে নিলাম এই মুহূর্ত থেকে।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল অফিসারটি। তারপর অকস্মাৎ একলাফে সে পাশের খোলা দরজা দিয়ে লাগোয়া চার্টরুমে গিয়ে চিৎকার করে উঠল, সুজা! ক্যাপ্টেনকে ডেকে আনো।

আলভেস হাতের সাব মেসিনগান উঁচিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল।

—না না, ওয়ালডি, দাঁড়াও, থামো, চিৎকার করে উঠলেন ক্যাপ্টেন গালভাও কিন্তু তার পূর্বেই আল'ভস-এর মেসিনগান সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য গর্জে উঠল আর জাহাজের সেই অফিসার ডেকে আছড়ে পড়ে গেল প্রাণ হারিয়ে। তার ইউনিফর্মের পিঠের কাছ থেকে ফিনকি দিয়ে বের হওয়া রক্তে স্থানটা ভেসে যেতে লাগলো।

আমি ছুটে গেলাম চার্টরুমে। তন্মুহূর্তে দেখলাম অপর একজন অফিসার পাশের দরজা খুলে বাইরে বের হবার চেষ্টা করছে। আমি আমার পিস্তল থেকে দুরাউণ্ড গুলি করলাম তারপর ছুটে গেলাম সেই দিকে। লোকটা ক্যাপ্টেনের কেবিনের পানে যাচ্ছিল, আবার গুলি করলাম। লোকটা মুখ থুবড়ে ডেক-এ পড়ে গেল।

আমি ফিরে এলাম ব্রীজ-এ।

একটা টেলিফোন বেজে যাচ্ছিল ক্রিং···ক্রিং···ক্রিং···গালভাও রিসিভার তুললেন। তার গম্ভীর মুখ সহসা উদ্ভাসিত হল। টেলিফোনে শোনা গেল, আমরা রেডিওরুম দখল করে ফেলেছি। এর পরে পরেই অপরাপর স্কোয়াডেরা তাদের কার্যোদ্ধারের সংবাদ দিল। ইঞ্জিনরুম সহজেই দখলে এসেছে, নাবিকরা বিনা প্রতিবাদে আত্মসমর্পণ করেছে। অফিসারদের কোয়ার্টারে বাধা দেওয়ার সময় জনৈক ডাক্তার আহত হয়েছে। বাদবাকিরা নিঃশব্দে অধীনতা মেনে নিয়েছে।

গালভাও তখন ক্যাপ্টেন মেরিও মেইয়াকে তার ঘরে ডেকে সমস্ত

ব্যাপার অবগত করালেন। মেইয়া শুধু জানতে চাইল, তিনি তাঁর অফিসারদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ করতে পারেন কিনা। কয় মিনিট বাদে ক্যাপ্টেন জানালো যে তিনি তার কম্যাণ্ডপদ সপ্রতিবাদে ছেড়ে দিয়ে আত্মসমর্পণ করেছেন।

বেশ সহজ সরল প্রায় নির্বিঘ্নে কার্যসমাধা হয়ে গেল। একজন লোক খুন ও জন দুই আহত হয়েছে কিন্তু এত অল্পেই সাণ্টামারিয়া জাহাজ আমাদের পুরোপুরি দখলে এসে গেছে।

এখন আমাদের এই জাহাজকে তার ৬০০ অনিচ্ছুক যাত্রী ও বন্দীদের নিয়ে ৬০০০ মাইল দূরত্বে আফ্রিকাস্থিত অ্যাংগোলা বন্দরে চালিয়ে নিতে হবে। ওয়ালডিস অ্যালভেস যে বলেছিল বেশ ফূর্তি বা মজার সবে বুঝি শুরু হল।

সকালে ফার্স্ট ক্লাস লাউঞ্জে, ক্যাপ্টেন গালভাও সমস্ত যাত্রীদের নিয়ে এক সভা ডাকলেন। আমরা প্রত্যেক পোষাক পালটে পরেছি খাকী ইউনিফর্ম, মাথায় কালো ক্যাপ, আর হাতে পর্তুগালের রঙিন চিহ্ন স্বরূপ লাল এবং সবুজ বাহু বন্ধনী।

যাত্রী সাধারণরা ইউনিফর্ম পরা একদল আকাশ থেকে পড়া মানুষ জাহাজে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে দেখে তাজ্জব হয়ে গেল। তারপর গালভাও এর মুখে জাহাজ দখলের কাহিনী শুনে, ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। বলে কি! মিটিং-এর পর তারা আমাদের ঘিরে ধরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলো। উৎকণ্ঠিত সব প্রশ্ন। আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলের নাম বাদ দিয়ে আর আর প্রশ্নের যথা সম্ভব উত্তর দিলাম। গন্তব্যস্থল রইল অত্যন্ত গোপনীয়।

রবিবার ২২শে জানুয়ারী কাটলো নির্বিঘ্নে। ক্রু'রা সুবোধ বালকের মত আজ্ঞাবহ হয়ে কাজ করে যেতে লাগলো। যাত্রী সাধারণের মন ক্রমশ কিঞ্চিৎ হালকা হয়ে এল। তাদের মধ্যে কিছু বিশেষ করে মার্কিন নাগরিকরা যেন অকল্পনীয় এ অ্যাডভেঞ্চারকে বেশ উপভোগই করতে লাগলো।

কিছু কিছু সুন্দরী মেয়ে এসে আমাদের দলের লোকের সঙ্গে ভিড়তে শুরু করলো। আমার নজরে পড়লো সেই কৃষ্ণকেশী মেয়েটিকে যে ওয়ালডির আলভেস-এর সঙ্গে নেচেছিল ; এখন সে নামে মাত্র একটা বিকিনি বেদিং স্যুট পরে, আলভেস-এর সেন্ট্রি পোষ্টের কাছে দাঁড়িয়ে হাস্যে লাস্যে কথা বলে যাচ্ছে। আমাদের নেভিগেটর জর্জ মেয়র জাহাজের গতিমুখ ফিরিয়ে তা পূর্বমুখী করে ফেলছে। গালভাও তাকে প্রথমে ব্রিটিশ ওয়েষ্টইণ্ডিজ এর সেণ্ট ল্যুনিয়ার দিকে চালাতে বলেছে। আমাদের আদি পরিকল্পনা ছিল স্থলভাগ পরিহার করে চলা। কিন্তু জাহাজের দুজন আহত লোকের অবস্থা খারাপ হওয়ায় এবং অপর এক নাবিক হ্যাবারোগে আক্রান্ত থাকায়, গালভাও স্থির করলেন এদের সেণ্টলুনিয়াতে নামিয়ে দেওয়া হবে।

আমরা ২৩ তারিখে উক্ত দ্বীপ থেকে কিছু দূরে নেমে একটা নৌকা নামালাম জাহাজ থেকে বেলা ৯টায়। একটা কাকতালীয় ঘটনায় দেখা গেল আলভেস যাকে মেরেছে এবং আমি যাকে গুলি করেছি এরা দুজনেই ছিল সিক্রেট পুলিশ এজেণ্ট। নাম ছিল কস্টা ও সুজা। আমাদের জানিত আরও কিছু সিক্রেট এজেণ্টদের ধরে নৌকায় নামালাম, সঙ্গে আহত ডাক্তার, অসুস্থ নাবিক আর নৌকা চালাবার জন্য দুতিনজন ক্রু গেল। সালাজারের এজেণ্টদের জাহাজ থেকে পরিষ্কার করলে আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচবো আর ক্রুরাও বিনাবাক্যব্যয়ে আদেশানুযায়ী কাজ চালিয়ে যাবে। কালক্রমে আমাদের দলে চলে আসবে।

সেদিন শেষ বিকেলে সংবাদ এল রেডিও মারফৎ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ব্রিটিশরা ঘোষণা করেছে যে "জলদস্যুরা" সাণ্টা মেরিয়া নামক পর্তুগীজ জাহাজকে দখল করে নিয়েছে। ব্রিটিশ নেভি দুটি ডেষ্ট্রয়ার পাঠাচ্ছে আমাদের খোঁজে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নেভিও একটি সাবমেরিনসহ দুটি ডেষ্ট্রয়ার নিযুক্ত করছে আমাদের পাকড়াও করতে। পর্তুগাল-এ সালাজার সরকার দাবি জানিয়েছে অবিলম্বে আমাদের

ধরা হোক এবং ফাঁসী দেওয়া হোক। এ প্রস্তাবে নাকি জনৈক মার্কিন অ্যাডমিরাল সম্মতি জানিয়েছে।

এখনই হল সময় আমাদের দিককার কথা সবাইকে জানিয়ে দেওয়া। আমাদের উদ্দেশ্যের কথা, আমাদের আদর্শের কথা। গালভাও সংবাদপত্র ও ইউনাইটেড নেসন্সকে উদ্দেশ্য করে রেডিও মেসেজ ছেড়ে দিলেন। তাতে জানানো হল আমাদের গতিপথ ও আমাদের উদ্দেশ্যের কথা। তিনি জানালেন আমরা জলদস্যু নই আমরা হলাম বিপ্লবী, পর্তুগীজ স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আমরা বৈধ রাজনৈতিক একটি কার্যক্রম চালিয়েছি মাত্র। এটা সালাজারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

জাহাজ দখলের তিনদিন বাদে ২৫ তারিখে ড্যানিস মালবাহী 'ভিবকে গুলওয়া' সান্টামারিয়াকে প্রথম দেখতে পায়। ঐ জাহাজ আমাদের সঠিক সামুদ্রিক অবস্থিতি চরাচরে জানিয়ে দেবে একথা নিশ্চিত হওয়ায় আমাদের নেভিগেটর মেয়র সান্টা মেরিয়ার গতিপথ ফের পালটে দিল।

ইতিমধ্যে দিনে দিনে অনুসন্ধান কার্য চরম জোরদার হয়ে উঠেছে। আমেরিকানরা আরও দুটি ডেষ্ট্রয়ার এবং একটী ফ্লিটট্যাঙ্কার পাঠাচ্ছে আফ্রিকা থেকে। পর্তুগীজ সরকার তার যাবতীয় জাহাজকে অনুসন্ধান কার্যে লাগিয়ে আদেশজারি করেছে। যে করেই হোক খুঁজে বের করো জলদস্যুদের করতলগত সান্টা মেরিয়া জাহাজকে। পর্তুগীজ নেভিকে সাহায্য করছে স্প্যানিশ নেভি। এমনকি ব্রাজিলের নেভিও আমাদের খোঁজে নেমে পড়েছে। অতএব কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যে কোন না কোন জাহাজের নজরে আমরা পড়ে যাব এ বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নেই।

সেদিনই প্রায় সন্ধ্যার মুখে আমাদের দিকে এগিয়ে আসা একটি প্লেন-এর শব্দ পেলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্লেনটি আমাদের জাহাজের মাথার ওপর আকাশে পাক খেতে লাগলো বৃত্তাকারে।

প্লেনটি মার্কিন নেভির নেপচুন পেট্রল বোম্বার। পাইলট চোখ ধাঁধানো এক সার্চলাইট ফেলে সমস্ত জাহাজকে আলোয় আলোয় উদ্ভাসিত করে ফেললো।

এর পরবর্তী দিনগুলিতে সান্টা মেরিয়া জাহাজে সবারই জীবনযাত্রা প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এল, যাত্রীরা রৌদ্র স্নান করতে লাগলো, নানাধরনের খেলাধূলায় মেতে রইল কিংবা জাহাজের দুটি সুইমিং পুলে এ সমানে সাঁতার কেটে যেতে থাকলো।

ডেকে খাকি পোষাক পরিহিত সশস্ত্র পেট্রল দেওয়া মানুষগুলোকে বাদ দিলে জাহাজের আবহাওয়া যে কোন লাকসারী লাইনারের মতই মনে হতে লাগলো।

পঞ্চম দিনে অর্থাৎ ২৭ তারিখের সকালে মাথার উপর আকাশে যখন আরও প্লেন এল তখন আমরা তেমন বিস্মিত হলাম না। এগুলো হল মার্কিন নেভি কনষ্টেলেসান ও নেপচুন, এরা পালা করে রিলে রেসের মত আমাদের জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে উড়তে লাগলো।

আমরা এও বুঝলাম ঐসব পাইলটরা অপরাপর জাহাজদের আমাদের সঠিক অবস্থিতি জানিয়ে পরিচালিত করতে সাহায্য করে চলেছে। ঘটনা যে এই দিকেই গড়াবে এটা তো জানা কথা কিন্তু অন্য আরেকটি নিদারুণ ঝঞ্চাট যে আমাদের জাহাজের মধ্যেই জন্ম নিচ্ছিল সে কথা আগে কে জানতো।

ওয়ালডির আলতের যথারীতি আমেরিকার কৃষ্ণ কেশী মেয়েটির প্রতি আকর্ষণ হারিয়েছে এবং সেই মেয়েটি বর্তমানে আমার দিকে আকৃষ্ট হয়ে উঠেছে। তার নাম ধরা যাক পেগি। মেয়েটি ওহিও-র একজন স্কুল শিক্ষিকা।

—পেড্রো আমার কেবিনে আমরা কজন মিলে আজ রাত্রে একটা পার্টি দিচ্ছি সুইমিং পুলে বিকেলে পেগি আমাকে বললে,

তোমার কি অফ-ডিউটি আছে? আমার ইচ্ছে তুমি সে পার্টিতে অবশ্যই উপস্থিত থাকো।

আমি টাইট বিকিনি পরা ওর উচ্ছল লোভনীয় যৌবনভরা দেহখানির পানে তাকালাম। এ বড় দারুণ প্রলোভন। না করতে পারলাম না, ঠিক আছে আমি যাব, আমি বললাম তবে একটু দেরী হবে কেননা আমার গার্ড ডিউটি মধ্য রাত্রি পর্যন্ত।

—ঠিক আছে। যখন তোমার খুসী এস। তবে আসা চাই-ই কিন্তু, পেগি চোখ নাচিয়ে মোহিনী হেসে বললে।

আমি যখন ডিউটি শেষে পেগির কেবিনে গেলাম তখন ওর পার্টি দুর্দান্ত গতিতে পুরোদমে চলছে। ছোট স্টেট রুমে পাঁচজোড়া যুবক-যুবতী জড়ো রয়েছে। পুরুষরা সবাই আমাদের দলের লোক। মেয়েদের মধ্যে পেগি ছাড়া আরও তিনজন আমেরিকান যুবতী ছিল। আর ছিল স্বর্ণ কেশী জনৈক স্প্যানিশ সুন্দরী এবং জনৈকা স্টুয়ার্ডেস। প্রত্যেকেই প্রচুর মদ্যপান করেছিল। ছেলেদের মুখময় লিপ স্টিকের ছাপ।

মধ্যরাত্রে অধিকাংশই চলে গেল। ওপরের বার্থে দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ একজোড়া যুবক-যুবতী তখনও ছিল। আমার দৃষ্টি সে দিকে পড়েছে দেখে পেগি খিলখিল করে হাসতে লাগলো।

—ওদের দেখে কিছু মনে করো না, পেগি ফিস ফিসিয়ে বললে, ওদের কাছে এ দুনিয়া সাময়িক মুছে গেছে। এখানে চলে এসে আরাম করো।

খালি একটা বার্থে আমাকে ও নিয়ে গিয়ে বসালো। তারপর দুটি পেলব বাহু বন্ধনে আমায় আবদ্ধ করে চুম্বনে চুম্বনে অস্থির করে তুললো। রক্তে আমায় তুফান বইয়ে ছাড়লো। হাত বাড়িয়ে লাইটের স্যুইচ অফ করে দিল পেগি। অন্ধকার কেবিন রোমান্সের উত্তাপে উত্তাল হয়ে উঠলো।

সেদিন সকালে অনুসন্ধানকারীরা ধরে ফেললো আমাদের জাহাজ। দুটি মার্কিন ডেষ্ট্রয়ার দেখা দিল। দ্রুত তাঁরা এগিয়ে এসে সাণ্টা মেরিয়ার দুপাশে স্থান করে সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকলো। রেডিও মারফৎ আমরা জানলাম যে আমেরিকানরা আমাদের আর জলদস্যু বলে গণ্য করছে না। তারা বরং আমাদের গার্ড দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, পাছে, কোন বিরুদ্ধচারী পর্তুগীজ বা স্প্যানিশ জাহাজ এসে আক্রমণ করে বসে।

ক্যাপ্টেন গালভাও হুশিয়ার করেছিল এই বলে যে সালাজারদের কাছে আত্মসমর্পণের চেয়ে জাহাজকে উড়িয়ে দেওয়া তিনি শ্রেয় মনে করেন। আমেরিকানরা নাকি সে রকম অবস্থার পূর্বেই যাত্রীদের নিরাপদে নামিয়ে নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।

ইতিমধ্যে আমাদের জাহাজ ব্রাজিলের উপকূলের কাছাকাছি বিষুবরেখার উপর দিয়ে চলেছে। ভীষণ গরম এখানে। এর ওপর দারুণ অবস্থা দাঁড়ালো এয়ার কণ্ডিসান সিস্টেম নষ্ট হয়ে যাওয়ায়' এমনিতেই নষ্ট হল না এর পেছনে কোন নাশকতামূলক কাজ ছিল আমরা তা জানতে পারিনি। জল রেশন করে দেওয়া হল। কি যাত্রী সাধারণ কি আমাদের দলীয় লোক কি নাবিকবৃন্দ সবার মনেই যেন একটা হতাশা আর নার্ভাসনেস ভাব দেখা দিল।

তারপর সেই চরম দুর্ঘটনাটি ঘটলো সেই ২৯শে জানুয়ারী বিকেলে। যার ফলে আমাদের অ্যাংগোলা পৌছনোর আশা সমূলে বিনষ্ট হল আর নিভে গেল আমাদের বিপ্লবের ক্ষীণতম শিখা।

আমি ব্রীজে ডিউটি করছিলাম। সহসা দরজা খুলে হুড়মুড় করে বেশ কয়েক জন উত্তেজিত যাত্রী এসে প্রবেশ করলো কেবিনে। তাদের নেতৃত্ব করছিল রাগে লাল হওয়া মাঝবয়সী জনৈক আমেরিকান। সে ঘরে ঢুকেই চীৎকার করে বললে, তোমরা বিপ্লবী কখনো নও।

—তোমরা একদল সাধারণ গুণ্ডা বিশেষ। মুখে বড় বড় মিথ্যে

বুলি তোমাদের, আমরা স্বৈরাচারী ডিক্টেটরকে গদিচ্যুত করতে চাই। হুঁ, যতসব ছল চাতুরীর কথা। তোমরা হলে 'জলদস্যু'—একদল অতি নীচ বোম্বেটে।

—আহা-হা, খুলে বলুন কি ব্যাপার হয়েছে, আমি তাদের শান্ত করবার প্রচেষ্টায় কোমল কণ্ঠে বলি।

—শোন, ইনি জানতে চাইছেন কি ব্যাপার হয়েছে, জনৈকা মহিলা বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে, তেমন কিছুই নয় মিষ্টার। শুধু তোমাদের একজন 'আদর্শবাদী' কমরেড একটি নাবালিকা স্প্যানিশ মেয়েকে নিয়ে একটি কেবিনে খিল এঁটেছেন। মেয়েটির আর্ত চীৎকারে কান পাতা যাচ্ছে না।

—বারবোসো, শিগগির ক্যাপ্টেন গালভাওকে খবর দাও, আমি ব্রীজের ওপর গার্ডকে উদ্দেশ্য করে বলি। তারপর যাত্রীদের দিকে ফিরে জিগ্যেস করি :

—কোথায় সেই লোকটা? আমায় সেখানে নিয়ে চলুন আপনারা।

কেবিনটি বি ডেক-এ অবস্থিত। দরজার কাছে যেতে কানে এল ভেতরের একটি নারী কণ্ঠের ক্রন্দন, আর একজন পুরুষ কণ্ঠের অট্টহাসি। দরজা খোলবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলাম ভেতর থেকে লক করা তা।

—এই—দরজা খোল এক্ষুণি, আমি চীৎকার করে বলে উঠি।

—চুলোয় যাও, পরিচিত কণ্ঠস্বরে ভেতর থেকে গর্জন আসে, দরজার সামনে থেকে সরে যাও, নয়ত আমি গুলি করব।

আমার পেছনে যেসব যাত্রী ভীড় করে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের সরিয়ে দিলাম। হাতে তুলে ধরলাম আমার পিস্তল। তারপর কিছু দূর থেকে আধা দৌড়ে এসে দরজায় মারলাম প্রচণ্ড ধাক্কা। কব্জা একটু ফাঁক হতে দ্রুত হস্তে আঙুল গলিয়ে লক খুলে দিতে দরজা খুলে গেল।

সম্মুণায় দেখলাম অসংলগ্ন পোষাকে ওয়ালডির আলভেস হাঁটু গেড়ে বসে আছে। বিছানায় শয্যাগত অবস্থায় একটি অর্ধনগ্না বালিকা, পোষাক-আশাক ছিন্ন-ভিন্ন অবস্থায় এখানে সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে। বছর ষোলর ওপরে হবে না কিশোরীর বয়েস। তার মুখে নানাপ্রকার রক্তাক্ত আঁচড়ের দাগ। মেয়েটি আতঙ্কে গোঙাচ্ছে।

ত্রস্তে ছুটে গিয়ে একটা চেয়ারে রাখা আলভেস-এর পিস্তল বেল্টটাকে বাঁ হাতে সরিয়ে নিলাম।

আলভেস-এর মুখ ভ্রূকুটি কুটিল হল। বললে—জানো, এই খুদে মেয়েটা কিছুতেই কেবিনে আসতে চায় না। শেষকালে অনেক কায়দা-কানুন করে ছলে বলে তবে এনে ঢুকিয়েছি এই কেবিনে। বুঝতেই পারছ পেড্রো একটু ফূর্তি করবার জন্যেই আনা।

—পোষাক-আশাক এই মুহূর্তে পরে নাও, বলে আমি দরজায় জমা হওয়া যাত্রীদের বললাম, আপনারা এবার মেয়েটির ভার নিন।

কয়েকজন যাত্রী এগিয়ে এসে ক্রন্দনরতা বালিকাকে ধরে নিল। আমি আলভেসকে ঠেলতে ঠেলতে করিডোর দিয়ে নিয়ে চললাম।

ক্যাপ্টেন গালভাও আরও কয়েকজনের সঙ্গে সংবাদ পেয়ে এদিকে আসছিলেন। তাঁর মুখের অবস্থা যেন বজ্র-বিদ্যুৎ ভরা কালো ভয়ংকর মেঘের মত।

—বিশ্বাসঘাতক, ঠাস করে একটি চড় কসিয়ে তিনি আলভেসকে বললেন, জানোয়ার, তুমি আমাদের সকলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের সকলের মুখ পুড়িয়েছ, রাস্কেল।

আলভেসকে ক্যাপ্টেনের কেবিনে (বর্তমানে গালভাও-এর কেবিন) নিয়ে গেলাম। আমাদের মধ্যে যারা অফডিউটি এমন বারোজনকে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে আনা হল আর নেওয়া হল প্রত্যেক ক্লাসের যাত্রীদের থেকে একজন করে তিনজন প্রতিনিধি সাক্ষী হিসেবে। ক্যাপ্টেন গালভাও উঠে দাঁড়িয়ে বজ্রকঠোর কণ্ঠে বলতে লাগতে লাগলেন :

এটা হচ্ছে একটা মাঝারি কোর্ট মার্শাল। ওয়ালডির অ্যালভেস তুমি একটি অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকার উপর বলাৎকারের অভিযোগে অভিযুক্ত। নিজের স্বপক্ষে তোমার কি বলবার আছে বলে ফেলো?

দ্রুত বিচারপর্ব শুরু হয়ে গেল। দুজন যাত্রী ও আমি বর্ণনা করলাম উক্ত কেবিনের মধ্যে আমরা কি দেখেছি। আলভেস কোন কিছু বলতেই অস্বীকার করল। আমার মনে হল ওর কি গুরুতর পরিণতি হতে চলেছে তা বোধ করি ও আঁচ করে ফেলেছে।

গালভাও জজরূপে নিযুক্ত জর্জ মেয়র এবং আরও দুজনের সঙ্গে নিম্নকণ্ঠে ফিসফিসিয়ে কি যেন আলোচনা করলেন। তারপর আলভেস-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে গেলেন :

আমাদের জলদস্যুতার অপবাদে অভিযুক্ত করেছে। অথচ আমরা জলদস্যু আদৌ নই। আমরা সৎ ধর্মভীরু মানুষ, আমাদের এই জাহাজ দখলের একমাত্র উদ্দেশ্য হল রক্তাক্ত খুনে ডিক্টেটরসিপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। তুমি ওয়ালডির আলভেস আমাদের মহৎ আদর্শের মুখে চুণকালী মাখিয়ে দিলে। তুমি তোমার সহকর্মী কমরেডদের নিরাপত্তা সাংঘাতিকভাবে বিঘ্নিত করে দিলে, আর বিপদাপন্ন করলে আমাদের মহৎ আদর্শকে। এই কোর্ট তোমাকে উপরোক্ত অভিযোগে অভিযুক্ত করে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিল। তোমাকে এখুনি গুলি করে হত্যা করা হবে।

আমরা কয়েকজন মিলে ওকে জাহাজের একেবারে পশ্চাৎভাগের ডেক-এ নিয়ে গেলাম। সেখানে নিয়ে ওকে রেলিং এর পাশে দাঁড় করিয়ে দিলাম। দুজন লোক টমিগান নিয়ে নিশানা করে দাঁড়ালো। আলভেসের দৃষ্টি ফাঁকা, একেবারে শূন্যপ্রায়, সে যেন বুঝে উঠতে পারছে না কি ঘটতে চলেছে তার। দুজন লোক তাদের অস্ত্র তুলে ধরে তাগ করলো, গুরুগম্ভীর ফ্যাকাসে মুখ নিয়ে ক্যাপ্টেন গালভাও সামান্য মাথা নত করলো।

একই সঙ্গে দুটি গান গর্জে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে আলভেস এর

প্রাণহীন দেহ ডেক-এ ঢলে পড়লো। কয়েক সেকেণ্ড বাদে তার দেহটাকে সাণ্টা মেরিয়ার প্রপেলারের ঘূর্ণিতে ফেনা তোলা সমুদ্রে রেলিং টপকে ফেলে দেওয়া হল। একবার ঢেউ-এর ঘূর্ণিতে ভেসে উঠে লাস চিরদিনের মত তলিয়ে গেল।

সুবিচার হয়ে আসামী দণ্ড ভোগ করলো। কিন্তু যাত্রীদের ক্রোধের বুঝি উপশম হল না। তারা যেন ক্ষেপে উঠেছে, ভয়ংকর ক্রোধে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

আমরা সংখ্যায় মাত্র ২৪ জন মানুষ। সমস্ত জাহাজভর্তি হাজার খানেক ক্রুদ্ধ শত্রুর দ্বারা পরিবৃত হয়ে গেলাম।

এতগুলো শত্রু নিয়ে দক্ষিণ অ্যাটলান্টিক পাড়ি দেওয়া অসম্ভব কল্পনা। ওদের অবশ্যই তীরে নামিয়ে দিতে হবে।

সে রাত্রে গালভাও বেতার যোগে জাহাজের ওপর চক্রাকারে ওড়া এক প্লেনের আমেরিকান নেভাল পাইলটের সঙ্গে কথা বললেন। তিনি ব্রাজিলের আঞ্চলিক সমুদ্রের তিন মাইল বাইরে রেসাইফ বন্দরের নিকট রিয়ার অ্যাডমিরাল স্মিথ-এর সঙ্গে দেখা করে যাত্রীদের তীরে নামিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে রাজি হলেন।

আমাদের দলের অনেকের এ আশা হয়েছিল যে যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে শুধুমাত্র ক্রুদের নিয়ে আমরা এরপর অ্যাংগোলায় পাড়ি জমাতে পারব। কিন্তু আমি বুঝেছিলাম যে সেটা অসম্ভব। সময় ও সুযোগ এখন আমাদের শত্রু পক্ষের অনুকূলে। পর্তুগীজ ও স্প্যানিশ জাহাজ আমাদের ধরতে ছুটে আসছে, তারা ব্রাজিলের কাছাকাছি এসে গেছে। আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে যেই যাত্রীরা নির্বিঘ্নে তীরে নেমে যাবে, অমনি শত্রুভাবাপন্ন ক্রুরা আমাদের নিরস্ত্র রবার প্রবল চেষ্টা করবে। আমরা ২৪ জন আর ওরা ৩৬০। এর কোন আশা নেই।

ণ্টা মেরিয়ার এর পরের কাহিনী সবার জানা। ৩১শে

জানুয়ারী আমরা ব্রাজিলের কাছাকাছি হতে অ্যাডমিরাল স্মিথ আমাদের জাহাজে উঠে এলেন একদল প্রতিনিধি সহ। যদিও গালভাও যাত্রীরা নেমে গেলে জাহাজ নিয়ে ফের যাত্রা করবার দাবির প্রতি একনিষ্ঠ রইলেন। কিন্তু তার সে দাবি বাস্তবে রূপায়ণের শক্তি তার কোথায় ?

শুধুমাত্র তিনি এই অনুরোধ জানাতে পারেন যে আমাদের যেন ব্রাজিল রাজনৈতিক আশ্রয়দান মঞ্জুর করে এবং গ্রেপ্তার থেকে বাঁচায়। স্প্যানিশ নাবালিকাকে ধর্ষণ করে আলভেস আমাদের সমস্ত আশা আকাঙ্খাকে নির্মূল করে দিয়ে গেছে। আমাদের অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও আমরা পবিপূর্ণ অসহায় এখন।

ফেব্রুয়ারীর দুই তারিখে লঞ্চ ভর্তি রিপোর্টার, ক্যামেরাম্যান এবং ব্রাজিলের নৌসেনা পরিবৃত্ত হয়ে 'সাণ্টা মারিয়া' রিসাইফ বন্দরে নোঙর ফেললো। প্রথম যাত্রীদের তীরে নামানো হল, শেষে নামলো ক্রুরা। গালভাওয়ের সহচর আমরা শেষ অবধি জাহাজে রইলাম রূপকভাবে জাহাজের কর্তৃত্ব নিয়ে। অবশেষে আমরাও সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলাম লঞ্চে।

লঞ্চ তীরের দিকে অগ্রসর হতে আমি ঘাড় ফিরিয়ে ফেলে আসা 'সাণ্টা মারিয়া' জাহাজের পানে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকালাম। আমার পাশে দাঁড়ানো ক্যাপ্টেন গালভাও-ও সেদিকে তাকিয়ে ছিলেন। দাঁতে দাঁত চাপা ফুলিশ কঠোর তার অভিব্যক্তি। ১২ দিন ধরে ২৮০০ মাইল সমুদ্রপথ আমরা ঐ জাহাজকে দখল করেছিলাম— সারা বিশ্বের দু'ডজন মানুষ আমরা। এখন সব শেষ হয়ে গেল।

শেষ অবশ্য হয়নি। ওদের 'সাণ্টামারিয়া' দখল বুঝি সংগ্রামের শুরু এবং স্বৈরাচারী ডিক্টেটার সালাজারের শেষের শুরু।

এরপর ইতিহাস জানে লিসবনের বৃক্ষরাজি শোভিত মনোরম সড়ক অ্যাভেনিডা ডি লিবারডেড-এ অ্যানটনিও ডি ওলিভেইরা সালাজারের কাল শেষ হয়ে গেল। গেল তার আফ্রিকার উপনিবেশ

অ্যাংগালো ও মোজাম্বিক, গেল ভারতীয় গোয়া, দমন, দিউ ইত্যাদি ইত্যাদি।

অতএব তথাকথিত 'বোম্বেটে জলদস্যু'রূপী ক্যাপ্টেন গালভাওয়ের দুঃসাহসিক অভিযান আদৌ ব্যর্থ হয়নি। ওদের আশা ফলবতী হয়েছে দেখে ওরা অবশ্যই আনন্দলাভ করেছে।

দুই

ভাবা যায়?

শুধুমাত্র একটি ফটোগ্রাফের জন্য পাকা দশহাজার পাউণ্ড পুরস্কার? হ্যাঁ ভাবা যায়।

কেন না, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি পর্যন্ত, সংবাদে প্রকাশ, ম্যাকাওস্থিত পর্তুগীজ পুলিসের এই আজগুবী পরিমান পুরস্কার দিগবিদিকে ঘোষিত ছিল।

একটিমাত্র ফটো চাই!!

কার ফটো?

একজন চীনা মহিলার আপ-টু-ডেট ফটো চাই। তার নাম? তার নাম হল ম্যাডাম উয়ং।

উপরন্তু এমন ঢালাও আদেশও ছিল কর্তৃপক্ষের যে, যে এই মহিলাকে সশরীরে ধরে এনে উপস্থিত করতে সক্ষম হবে সে যেন তার পুরস্কারের অঙ্ক নিজেই বসিয়ে নেয়।

শুধুমাত্র পর্তুগীজ সরকারই নয়, জাপান, ফরমোসা, হংকং ফিলিপাইন, থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া প্রভৃতি যাবতীয় সরকার সমূহও সাগ্রহে এই অলিখিত ও সীমাহীন অঙ্কের পুরস্কার প্রদানে অংশ নিতে সর্বান্তঃকরণে রাজী।

এই একটি মাত্র ফটোর জন্য আজগুবী দশহাজার পাউণ্ডের পুরস্কার ঘোষিত হয়ে পড়ে আছে সেই ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ থেকে।

বহু লোক লোভনীয় এই অর্থপ্রাপ্তির আশায় প্রাণপণ চেষ্টা করেছে একটি ফটো সংগ্রহের। কিন্তু ফটো তো সংগ্রহ হয়ইনি, সংগ্রহ করেছে শুধু ভয়াবহ মৃত্যু। অর্থাৎ তাদের প্রাণপণ প্রচেষ্টার পরিণতি হয়েছে তাদের নিষ্ঠুরতম প্রক্রিয়ায় প্রাণহীনতা।

পর্তুগীজ পুলিশ এবং দূর প্রাচ্যের যাবতীয় দেশের পুলিশ খুঁজে ফিরছে এই কুখ্যাত ম্যাডাম উয়ং-কে। কারণ?

কারণ হল, এই মহিলা হল চীন সমুদ্র অঞ্চলের সর্বপ্রধানা জলদস্যু মেয়ে।

একে যদি গ্রেপ্তার করা যায়, একে যদি বন্দিনী করে রাখা যায় তাহলে উক্ত অঞ্চলের জলদস্যুপনার ৬০ শতাংশ যে হ্রাস পেয়ে যাবে সে বিষয়ে উক্ত সব পুলিশ কর্তৃপক্ষদের বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

এই জলদস্যু মেয়ের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল সুবিশাল এক সামুদ্রিক অঞ্চল নিয়ে।

দ্বীপ লাঞ্ছিত এই সমুদ্র উত্তরে সাংহাই বন্দর থেকে দক্ষিণে টিমর পর্যন্ত বিস্তৃত। আর পশ্চিমে এর সীমা থাইল্যাণ্ড উপসাগর থেকে পূবে পেটে ফিলিপস অবধি।

সুদীর্ঘ এই অঞ্চলে বোম্বেটে গিরির জমজমাট ব্যবসা ছিল ওদের। এক সময়তো এ ব্যবসা যেন অভাবনীয় ভাবে ফনফনিয়ে ফুলে ফেঁপে উঠেছিল।

আগের যুগ থেকে সম্প্রতি এই জলদস্যুদের ছিনতাই এর মাত্রা যেন শতগুনে বেড়ে গিয়েছে। মালপত্রের দিক থেকেও ওরা প্রভূত মূল্যবান এবং প্রচুর পরিমান দ্রব্য সম্ভার লুণ্ঠন করে নিচ্ছিল।

এর কারণ হল, এই সুবিস্তৃত সামুদ্রিক অঞ্চল হল বিশ্বের মধ্যে একটি অতিব্যস্ত জাহাজ চলাচলকারী অঞ্চল।

ছোট বড় মাঝারি বিচিত্র আকার ও প্রকারের শত সহস্র জাহাজ

চীন সমুদ্রের পূব ও দক্ষিণে স্লুলু, সেনিবিস এবং পীত সাগরে অহোরাত্র দিগবিদিকে চলাচল করে চলেছে।

যে কোন দিন যে কোন সময়ে, হিসেব নিলে দেখা যাবে যে কম সে কম ৫০০০ জাহাজ ঐ অঞ্চল দিয়ে চলাফেরা করছেই।

অতএব ঐ অঞ্চলটি যে জলদস্যু বোম্বেটেদের পক্ষে একটি স্বর্গোদ্যান স্বরূপ ছিল তাতে আর বিচিত্র কি!

এই লুঠেরা ব্যবসা এতই বোলবোলাও ছিল যে শুনলে অবাক লাগে, উক্ত অঞ্চলের প্রধান জলদস্যুদলের কারুর কারুর নাকি হংকং-এ হেড কোয়ার্টার অফিস পর্যন্ত ছিল।

হংকং! দূর প্রাচ্যের এই দ্বীপ নগরী ব্যবসাবানিজ্য লেনদেন-এর ব্যাপারে জগদ্বিখ্যাত।

হংকং বন্দরের স্থান নিউইয়র্ক, রটাবডাম এবং লণ্ডনের পরেই।

এই প্রখ্যাত বা কুখ্যাত বন্দর নগরীতে সুযোগ সন্ধানী লোকেরা এ দুনিয়ায় এমন কোন বস্তু নেই যা না সে কিনতে পারে।

অর্থ ঢাললে কি না পাওয়া যায় এখানে?

মার্কীন জেট বিমান, রাশিয়ার সোনা, শ্বেতকায়া এবং পীতকায়া এমনকি কৃষ্ণকায়া স্ত্রীলোক কিংবা হীরক বা যাবতীয় নেশাদ্রব্য, অস্ত্রশস্ত্র, দেশ বিদেশের গোপন সংবাদাদি, প্রয়োজন হলে যে কোন পাসপোর্ট—সব কিছু ক্রয় করা যায় এই আজব নগরীতে।

এ নগরে বিচিত্র সব বহু সংখ্যক জিনিষাদি প্রস্তুত হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রভূত পরিমাণে রপ্তানী হয়ে থাকে।

ঘড়ি, ক্যামেরা, পুতুল, পোশাক আশাক, ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি এবং চীনামাটির তৈজসাদি বহুল পরিমাণে এখান থেকে দেশে দেশে যায়।

নয়নাভিরাম, বহুতলা বিশিষ্ট দীর্ঘাঙ্গ অট্টালিকা শোভিত এই নগরে দুনিয়ার তাবৎ প্রখ্যাত ব্যবসায়ি প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকের এক একটি করে শাখা অফিস বর্তমান রয়েছে।

প্রায় সোয়ালক্ষ রেজিষ্টার্ড ফার্ম আছে এই হংকং-এ। এদের মধ্যে কিছু ফার্মের কাজকারবার সন্দেহজনক। এদের সাইন বোর্ডে লেখা থাকে এক, ভেতরে কাজ হয় অন্য। এখানে এত বিপুল ব্যবসা বাণিজ্যের জটিলতা যে কর্তৃপক্ষেব পক্ষে এই সব সন্দেহজনক ফার্মের গোপন কার্যাদির দিকে নজর দেওয়া সম্ভব নয়।

হংকং-এ তাই বুঝি, জলদস্যুদের কাছে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। অনায়াসে তারা ভিন্ন নামে একটি অফিস খোলে। ধরা যাক ইয়ান ট্রেডিং কোম্পানি। এতে প্রতিষ্ঠানটিব সততা সম্পর্কে কারুর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকবার কথা নয়।

আসলে কিন্তু এদের প্রধান কাজ হল নগরীর অপরাপর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মাল চলাচল এবং জাহাজ আসা যাওয়ার খুঁটিনাটি সংবাদ সংগ্রহ করা। অতপর সুযোগ বুঝে যথা কালে এবং যথাসময়ে উক্ত জাহাজটি আক্রমণ করে মূল্যবান মালপত্র অপহরণ করে দুনিয়ার তাবৎ চোবাবাজারে চালান করে দেওয়া।

এই নগরীতেই বুঝি পৃথিবীর চলমান ইতিহাসের কিছু কিছু অংশ রচিত হয়ে যায়। বিশ্বের বহু দেশের গুপ্তচর চক্র এখানে কাজ করছে। এখানে প্রচাব যন্ত্র খুবই সক্রিয়।

এখানে পাশপোর্ট তৈরীর গুপ্ত ফ্যাক্টরী আছে বলা চলে।

তাই গুপ্তচর এবং প্রতিগুপ্তচরদের পক্ষে অতীব আদর্শ নগরী এই হংকং। কেননা, এখানে প্রবেশ ও প্রস্থান এবং গা ঢাকা দেওয়া জলের মত সহজ।

চীন সমুদ্রে জলদস্যুদের বোম্বেটেগিরি ব্যবসা বুঝি প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে চলতি ছিল ভাস ভাবেই।

তবে যখন থেকে ইংরেজবা দূর প্রাচ্যের সমুদ্রাঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব শুরু করে সে সময় থেকে জলদস্যুদের উপদ্রব বহুলাংশে সংযত হয়ে যায়।

এরপর ধরতে গেলে প্রায় বন্ধই থাকে বিগত বিশ্ব যুদ্ধের কয়েকটা

বছর। সে সময় ঐ অঞ্চলে শুধু সামরিক নৌবহরই চলাচল করত ; তখন জাপানীরা কোন অসামরিক জলযানকে সন্দেহজনক মনে হলেই তার মাঝি মাল্লা নাবিকদের সরাসরি মুণ্ডচ্ছেদ করে ফেলতো। এই ভয়ে প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সে সময় ঘৃণ্য জলদস্যুপনা।

এতদসত্বেও সে সময় একজন মাত্র জলদস্যু তার ব্যবসা বেশ ভাল ভাবেই চালিয়ে যাচ্ছিল।

সে কে ? সে হল উয়ং কাংগকিট নামক জনৈক চীনা জাতীয়তা বাদী সরকারের প্রাক্তন চাকুরে।

এই উয়ং কোথা থেকে তার প্রারম্ভিক মূলধন সংগ্রহ করল কেউ তা জানে না। তবে ১৯৪০-এ যখন সে সরকারী চাকুরী ত্যাগ করে বোম্বেটেগিরি ব্যবসায় নামে সে সময় তার হাতে অবশ্যই প্রভূত আর্থিক মূলধন ছিল।

তার এই অদ্ভুত ব্যবসায়ে সে সঙ্গে নিয়ে গেল তার সুশ্রী তরুণী পত্নী শান্-কে।

১৯৩৯-এ এদের বিবাহ হয়। এখন এই শান নাম্নী মেয়েটি ছিল ক্যাণ্টনের নাইটক্লাবের এক নর্তকী।

লুণ্ঠনের মাত্রা অবশ্য যুদ্ধ কালীন সময়ে বিশেষ উচ্চে ছিল না। তবে উয়ং অন্য পথে অর্থোপার্জনে ফুলে ফেঁপে উঠল।

তার তখনকার পেশা ছিল লুণ্ঠন, ছিনতাই, ব্ল্যাকমেল, গুপ্তচর-বৃত্তি এবং নরহত্যা প্রভৃতি।

শোনা যায় ১৯৪৬-এর মধ্যেই উয়ং সঞ্চয় করে ফেলেছিল আজগুবী এককোটি পাউণ্ডের মত অর্থ।

স্বামীর এই অবিশ্বাস্য রোজগার ও সঞ্চয়। সুতরাং তার তরুণী পত্নী ম্যাডাম উয়ং যে অজস্র অর্থব্যয়ে ক্রীত অভিজাত জীবন যাপনে অভ্যস্তা হয়ে পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কি।

এক সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শেষ হল।

আবার চীন সমুদ্রে ফিরে এল অজস্র সংখ্যায় বানিজ্য জাহাজ ;

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে সামরিক জাহাজও বেড়ে গেল সমমাত্রায়। যেখানেই যাওয়া যায় ব্রিটিশ, মার্কিন, ফরাসী, পর্তুগীজ যুদ্ধ জাহাজের ছড়াছড়ি।

ব্রিটিশ এবং ফরাসী কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করে দেখলো যে বিশেষ করে যুদ্ধ-দুর্গত-আর্তদের জন্য রিলিফ নিয়ে যাওয়া জাহাজগুলিই জলদস্যুদের লোভার্ত শ্যেনদৃষ্টি আকর্ষণ করবে সমধিক।

তাই, বোম্বেটেরা বেশী আস্কারা পাবার আগেই জলদস্যুপনার টুঁটি টিপে ধরবার জন্য সবিশেষ সচেষ্ট হল তারা।

ব্যবস্থাদি এমনই কঠোর হল যে তদানিন্তন জলদস্যু নায়ক উয়ং-কে বড় জাহাজাদি আক্রমণের বাসনা সাময়িক পরিত্যাগ করতে হল। উপায় নাই।

দুধের স্বাদ ঘোলেই মেটাতে হবে। জাঙ্ক নামক ছোট ছোট চীনা তরণীসমূহ লুণ্ঠন করেই কাল হরণ করে যেতে হল।

তারপর এল সেই রাত। ভয়ংকর রাত। ১৯৪৬-এব এক অমারাত।

উয়ং-এর কাছে চর মারফৎ সংবাদ এল যে ভাল মালভর্তি তিনটি জাঙ্ক সমুদ্র দিয়ে হংকং বন্দরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হয়ে গেল উয়ং। এগিয়ে গিয়ে তার তিনটি লঞ্চ নিয়ে ঘিরে ফেললো জাঙ্ক তিনটিকে।

হায়! উয়ং-এর জীবনের সবচেয়ে বড় বিস্ময় বুঝি লুক্কায়িত ছিল ঐ তিনটি তরণীর মধ্যে।

জাঙ্কগুলির মধ্যে তৈরী হয়ে বসে ছিল নৌ-সেনাবা।

কুড়ি মিনিটের লড়াই।

উয়ং আহত হয়ে কোনক্রমে একটি ছোট মোটর বোট-এ করে অকুস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

কিন্তু পথে ধৃত হয়ে পর্তুগীজ পুলিসের হাতে পড়ে। ধৃত অবস্থায় ম্যাকাও থেকে পালাবার চেষ্টা করতে পুলিসের গুলিতে সাংঘাতিক আহত হয় এবং তাতেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

আচমকা শত্রু সম্মুখীন, পরাজয়, গ্রেপ্তার ও মৃত্যু—এ সংবাদ পেয়ে দূর প্রাচ্যে অধিকাংশ মানুষের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে এবারে তাহলে তৎসৃষ্ট জলদস্যুতার সাম্রাজ্যের নিশ্চিত পতন হয়ে গেল।

কিন্তু না, বাস্তবে তা হল না।

এই ধারণা আদৌ ফলবতী হল না

কদিনের মধ্যেই আশ্চর্য এক খবর দিকে দিকে রটে গেল যে স্বয়ং মাডাম উয়ং স্বামীর ব্যবসা সুযোগ্যা সহধর্মিনীর মত নিজ হাতে তুলে নিয়েছে।

প্রথমে এটাকে একটা রসিকতাপূর্ণ ভূয়া সংবাদ বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল।

কেন না লোকের মনে তখন পর্যন্তও ম্যাডাম উয়ং একজন সুন্দরী অবলা প্রাক্তন নর্তকী রূপেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

তাছাড়া কোন চীনা মেয়ের পক্ষে পুরুষদের উপরে খবরদারি করাটা প্রকৃতই অস্বাভাবিক অবিশ্বাস্য ঘটনা বলে পরিগনিত হয়ে থাকে।

এদিকে উয়ং-এর দুজন সহকারী নেতা স্থির করলো যে ম্যাডাম উয়ং নয়, তারা দুজনেই হল মৃত নেতার জলদস্যুতার ব্যবসার প্রকৃত উত্তরাধিকারী।

এই দৃঢ় সংকল্পের কথা জানিয়ে তারা মানে মানে ম্যাডম উয়ং-কে কেটে পড়তে আদেশ দিল।

জবাব পেল তৎক্ষনাৎ।

বুকে একটি করে বুলেট বিদ্ধ হয়ে দুজন সহকারী নেতা প্রাণ হারালো নিমেষে। এবং স্বয়ং ম্যাডামের হাতের পিস্তল নিঃসৃত গুলিই সে দুটি।

এরপর অবশ্য কেউ উত্তরাধিকার নিয়ে মাথা ঘামায় নি আর।

একটি দ্বীপে করে, চার চারটি প্রবল দেশের নেভি-র বাধা অগ্রাহ্য

করে, এই ম্যাডাম উয়ং তার জলদস্যুতার ব্যবসায়ে প্রথম থেকেই দিনে দিনে অগ্রসর হতে লাগলো।

ম্যাডাম শুধুমাত্র সমুদ্রে জলযান আক্রমন বা লুণ্ঠন করেই সন্তুষ্ট রইল না। সে বন্দর অভিযানও চালালো। এমন কি জল ছেড়ে ডাঙ্গায় এসে মাল গুদাম থেকেও বিপুল পরিমান দ্রব্য সামগ্রী চুরি করতে লাগলো।

তখনও ফরাসী কর্তৃত্বে ছিল ইন্দোচীন।

ফরাসীরা যুদ্ধে বিধ্বস্ত বহু দেশে প্রচুর পরিমানে মাল পাঠাচ্ছিল জাহাজ যোগে।

সুযোগসন্ধানী ম্যাডাম উয়ং তার বোটগুলোকে রজ নদী ধরে হ্যানয় আর মেকং নদী ধরে সাইগন পর্যন্ত অতর্কিত হানা দেবার জন্য পাঠাতে লাগলো।

বসে থাকবার পাত্রী ম্যাডাম উয়ং নয়।

এক সময়ে অপরাপর জলদস্যুতার কাজ যখন রুদ্ধ সে সময় বাষ্পচালিত ক্রেন সহ একটি বার্জকে সমুদ্রে পাঠিয়ে দিল সুদূর সিঙ্গাপুর পর্যন্ত সমুদ্রতলে বিছানো রিজার্ভ কেব্‌ল্ তুলে এনে তাকে ছাড়িয়ে অভ্যন্তরস্থ তামা বের করে, সেগুলোকে আজগুবী মূল্যে ব্ল্যাকমার্কেটে বিক্রী করবার জন্য। প্রচুর লাভ করলো এই শ্রমসাধ্য দুঃসাহসিক ব্যবসায়ে।

হাতে খড়ির পর ম্যাডামের প্রথম প্রকৃত বড় কাজ হল ওলন্দাজ জাহাজ 'ভ্যান-স্যুয়েজ'কে আক্রমন। ক্যান্টন থেকে সোয়াটু যাচ্ছিল সে জাহাজ।

সাত সাতটি জাঙ্ক নৌকো নিয়ে ম্যাডাম ঐ জাহাজকে আক্রমণ করলো অন্ধকার এক রাত্রে। অতঃপর আচমকা তাকে ঘিরে ফেলে সেই জাহাজে আরোহণ করল জলদস্যুদল।

বেতার সংযোগ নষ্ট করে দিয়ে পাক্কা পনের ঘণ্টা ধরে জাহাজের মূল্যবান সমস্ত দ্রব্য সম্ভার অপহরণ করে নৌকোয় তোলে!

প্রতিটি যাত্রীকে তাদের নিজ নিজ সেলুনে আবদ্ধ থাকতে আদেশ দিয়ে তাদের হ্যাণ্ডব্যাগ মনিব্যাগ থেকে পর্যন্ত যাবতীয় অর্থাদি কেড়ে নেওয়া হয়।

সব মিলে প্রায় চারলক্ষ পাউণ্ডের মত নগদে ও জিনিষ অপহরণ করে জলদস্যুদল অদৃশ্য হয়ে যায়।

এ আক্রমণে একটি মানুষও আহত হয়নি, পনের ঘণ্টার অভিযানে ঐ জাহাজের নাবিকেরা ম্যাডাম উয়ং-এর ছায়া মাত্র দেখেছিল বারেক। স্পষ্ট দেখতে পায়নি চেহারা।

কখনো কখনো এই ধরণের অভিযানে ম্যাডাম সরাসরি নেতৃত্ব করেছে। সে সব অভিযানে নিষ্ঠুরতার চুড়ান্ত দৃষ্টান্তও রয়েছে।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস।

ম্যাডাম উয়ং একদা পরাজিত জাপানের কাছ থেকে চুরি করা দুটি মোটর টর্পেডো বোট নিয়ে মাঝ সমুদ্রে আক্রমণ করলো চার হাজার টনের মালবাহী পর্তুগীজ 'ওপর্টো'-কে।

ম্যাডাম উয়ং-এর আকণ্ঠ এবং নিঃসীম ঘৃণা ছিল পর্তুগীজদের প্রতি। কেননা তার ধারনা ছিল তার স্বামী উয়ং-এর মৃত্যুর জন্য ব্রিটিশদের চেয়ে পর্তুগীজরাই সর্বাংশে দায়ী।

'ওপর্টো' জাহাজ আক্রমণ করে তার বাইশজন নাবিককে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল।

তাদের সামনে দিয়ে প্যারেড ইন্সপেকশানের ভঙ্গীতে হেটে গেল ম্যাডাম উয়ং। পরনে তার ট্রাউজার্স এবং ব্লাউজ।

মাথায় বাঁকা ভাবে বসানো ফরাসী নেভাল টুপী। কানে চিক চিক করছে হীরে বসানো ইয়ারিং।

তন্বী গড়নের সুন্দরী তরুণী ম্যাডাম উয়ং-এর হাতের চাঁপাকলি আঙুলে ধরা ছিল সোনার পাইপে সিগারেট।

কোমরের বেল্ট-এ দুপাশে ঝুলছিল দুটি সুদৃশ্য রিভলবার।

একজন দোভাষীর সাহায্যে ম্যাডাম বন্দীদের উদ্দেশ্য করে

বললে, একবার ভালভাবে আমার পানে তাকাও, হ্যাঁ বেশ ভালভাবে।

হতচকিত বাইশজন নাবিক নিষ্পলক চাউনি নিয়ে এই অদ্ভুত মেয়ে বোম্বেটের পানে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে ছিল।

ম্যাডামের কণ্ঠ কিছুটা উচ্চগ্রামে উঠল, কী? এবারে আমাকে মনে রাখতে পারবে তো? ভুলবে না? চিনতে পারবে?

একে একে প্রত্যেককে সে স্বীকার করিয়ে নিল যে হ্যাঁ তারা কখনো ম্যাডামকে ভুলে যাবে না। ঠিক চিনতে পারবে।

—চিনতে পারবে? ক্রুর এক হাসি দেখা দিল ম্যাডাম উয়ং এর সুন্দর মুখমণ্ডলে, উহুঁ, এত ভাল কথা নয়। আমি চাই না যে কেউ আমাকে ভুলে না গিয়ে চিনতে পারুক। সুতরাং যেহেতু তোমরা চিনতে পারবে, অতএব এখুনি তোমাদের আমাকে হত্যা করে ফেলতে হবে।

এবং শুনলে শিউরে উঠতে হয় যে সত্যি সত্যিই তাই করল এই নিষ্ঠুরা রমণী ম্যাডাম উয়ং।

একটা কাঠের পাল্লার উপর দিয়ে প্রতিটি বন্দীকে সে হেঁটে যেতে বাধ্য করল। যখন তারা সে ভাবে হেঁটে যাচ্ছিল ম্যাডাম স্বয়ং রিভলবার সহ হাত তুলে চাঁপা কলির মত আঙুলে ট্রিগার টেনে টেনে তাদের প্রত্যেককে গুলি করে হত্যা করল।

এই রোমহর্ষক মর্মান্তিক কাহিনী শোনা গেছে উক্ত জাহাজ থেকে আহত অবস্থায় কিছুকাল জীবিত থাকা এক মেট-এর কাছ থেকে। মৃত্যুর পূর্বে সে যা বর্ণনা দিয়ে গিয়েছিল সেটাই বুঝি একমাত্র বিশ্বস্ত বর্ণনা ম্যাডাম উয়ং-এর।

এ ছাড়া অবশ্য হংকং—এ ম্যাডামের নর্তকী জীবনের একটা প্রায় ঝাপসা হয়ে যাওয়া, কাজে না লাগা ফটো রয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশত মেট যে চেহারার বর্ণনা দিয়েছে, সে ধরণের চেহারা লক্ষ লক্ষ চীনা মেয়ের হতে পারে।

সুতরাং এও বৃথা।

১৯৫১-তেই বোঝা গেল যে জলদস্যুতার লাভজনক এবং বেপরোয়া ব্যবসাটি ম্যাডাম উয়ং-এর চাঁপা ফুল সদৃশ আঙুলের মুষ্ঠির মধ্যে চলে গেছে।

ছোট ছোট কয়েকটি বোম্বেটে দল স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছে ওর সঙ্গে।

বাদবাকি কিছু দলকে বলপ্রয়োগ এবং ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে দলে টেনে নিয়েছে ম্যাডাম উয়ং।

শোনা যায় সেবারকার ব্রিটিশ জাহাজ 'ম্যালরী'র আক্রমণের পেছনেও ম্যাডামই ছিল।

ফরমোসা প্রণালী দিয়ে চলবার সময় একটা নৌকো অকস্মাৎ উক্ত জাহাজের সামনে এসে পড়ে।

ক্যাপ্টেন দুর্ঘটনা এড়াতে জাহাজ থামিয়ে দেয়। তন্মুহূর্তে দেখা যায় ঐ নৌকো থেকে পঁচিশজন লোক লাফিয়ে উঠে পড়ে জাহাজে।

চীনে, কোরিয়ান, ফরমোসান এবং মানচুরীয় প্রভৃতি দেশের এই সব বোম্বেটেরা আধুনিক মার্কিন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। এবং মজা এই যে তাদের দলনেতা ত্রুটিহীন পাকা ইংরিজীতে হুকুম চালিয়ে যাচ্ছিল।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে 'ম্যালর' জাহাজের মূল্যবান দ্রব্যাদি নৌকোয় খালাস করে জলদস্যুদল হাওয়া হয়ে যায়।

সে বছরই একটি ব্রিটিশ শিপিং কোম্পানী একটি বেনামী চিঠি পায়। তাতে লেখা:

> "তোমাদের জাহাজ ২৪শে আগস্ট বন্দর ছেড়ে গেলে অবশ্যই আক্রান্ত হবে। সময় যদি পালটাও তবুও পরিত্রাণ পাবে না। তোমরা যদি তোমাদের ঐ জাহাজের নিরাপত্তা চাও তো নিম্ন নির্দেশিত ভাবে আমাদের বিশহাজার হংকং ডলার প্রদান কর"—

বেনামী পত্রের নির্দেশমত সেই ব্রিটিশ কোম্পানী উক্ত পরিমান অর্থ দিয়ে সমূহ ক্ষতি থেকে নিজেদের বাঁচায়।

এই ধরণের বেনামী পত্র হংকং, ক্যান্টন, ম্যাকাও (পর্তুগীজ), সাইগন, এমন কি সিঙ্গাপুরের বহু শিপিং কোম্পানীও ক্রমান্বয়ে পেয়েছে।

হংকং স্থিত ব্রিটিশ নেভাল পুলিশের হিসেবমত তখন বাৎসরিক প্রায় পনের কোটি হংকং ডলার এইভাবে লুণ্ঠিত হত।

এই অর্থের মধ্যে বৃহদংশই ছিল ম্যাডাম উয়ং-এর কুক্ষিগত। সে-ই ছিল পালের গোদা।

পরের বছর আরেক প্রকার নতুন কায়দায় ছিনতাই হল। যাত্রীর ছদ্মবেশী পনের জন জলদস্যু হংকং ও ক্যান্টনের মধ্যে চলাচলকারী 'কংফেট' জাহাজে উঠে দুলক্ষ আশি হাজার ডলার ক্যাশ লুণ্ঠন করে পালিয়ে যায়।

কোরিয়ায় যুদ্ধ চলাকালীন সামরিক বস্তুর সাংঘাতিক ক্ষয়ক্ষতিতে নাজেহাল হয়ে মার্কীণ সরকার একটি ইনটেলিজেণ্ট টিম হংকং-এ পাঠায় তদন্ত এবং ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে।

ফল কিন্তু হল বড় মর্মান্তিক ও হাস্যকর।

জলদস্যুরা পরম কৌতুকভরে সেই গুপ্তচর দলের একটি পেট্রল বোটকেই তাদের নাকের ডগা থেকে চুরি করে জন্মের মত হাওয়া হয়ে গেল। নাকে যেন ঝামা ঘষে দিয়ে গেল বলা যায়।

এ ঘটনার পেছনে ম্যাডাম উয়ং-এর প্রত্যক্ষ হাত ছিল কিনা তার প্রত্যক্ষ কোন প্রমান হাতে না পাওয়া গেলেও অধিকাংশের সন্দেহ যে এ কারসাজির পেছনে ম্যাডামের ব্রেন থাকা আদৌ অসম্ভব নয়।

শোনা যায় ম্যাডাম প্রায়শঃই ম্যাকাও, হংকং, সিঙ্গাপুর এমন কি টোকিও নগরীতেও ঘুরে বেড়াতো। শুধু যে নানাবিধ সংবাদ সংগ্রহই উদ্দেশ্য থাকত তার তা নয়।

আরেকটি প্রধান কারণও ছিল এর পেছনে।

তা হল : জুয়া খেলা। ঐ একটি মাত্র দুর্বলতাই ছিল ম্যাডাম উয়ং-এর।

এ সংবাদ ম্যাকাও পুলিশের অজানা ছিল না। কিন্তু তারা নিরূপায়। কেননা অজস্র অভিজাত চীনা রমনীর মধ্যে থেকে জুয়ার আড্ডায় ম্যাডামকে সনাক্ত করে বেছে নেওয়া ছিল প্রকৃতই অসম্ভব ব্যাপার।

বাধ্য হয়ে তাই পর্তুগীজ পুলিশকে ম্যাডামের সর্বাধুনিক একটি ফটোগ্রাফের বিনিময়ে দশহাজার পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করতে হয়েছিল।

ঐ অঞ্চলে শুধু নয়, এ আজগুবী পরিমান অর্থের লোভে অনেকেই জীবন পণ করে চেষ্টা করে থাকে। করেছিলও অনেকে কিন্তু···

এই পুরস্কার ঘোষণার মাসখানেকের মধ্যে পর্তুগীজ পুলিশ চীফ ডাকে একটি প্যাকেট পেল।

তার ভেতরে লেখা একটি পত্র : এ ফটোগুলি আপনার কাজে লাগবে আশা করি। কেননা এ ছবিগুলি ম্যাডাম উয়ং-এর বিষয়েই।

পুলিশ চীফ উত্তেজিত কৌতুহলে প্যাকেটের মধ্যেকার ফটোগুলি বের করল······

দেখে তার চক্ষু স্থির। নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা দুজন মানুষের বিকৃত বীভৎস দেহের ফটোগ্রাফ ·····

সঙ্গে আর একটি ছোট পত্র : ম্যাডাম উয়ং-এর ছবি তুলতে চেষ্টা করার পরিণাম-এ ধৃত হয়ে এই বেচারারা আমাদের হাতে এই মৃত্যু বরণ করেছে, বুঝলেন ?

এই ধরণের ভয় দেখানো সত্বেও কিন্তু মানুষের চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। আরও বহু লোক, তাদের মধ্যে একজন গ্রীক সাংবাদিকও ছিল, যারা ম্যাডামের ফটো নেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু···প্রত্যেকেই করুণভাবে প্রাণ হারিয়েছে।

সেই গ্রীক সাংবাদিকের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ একটা চায়ের বাক্সে

ভর্তি করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল সিঙ্গাপুরস্থ গ্রীক কন্সালের অফিসে।

দশহাজার পাউণ্ডের পুরস্কার তখনও অদেয়ই রয়ে গেছে।

পর্তুগীজ সরকার ক্রমশ হতাশ হয়ে গেল। নাঃ আর আশা নেই ঐ বোম্বেটে মেয়ের ফটো পাওয়ার।

জলদস্যুদের দ্বারা অপহৃত মালপত্র চীন সমুদ্র থেকে হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী বোম্বে, কায়রো, কেপটাউন প্রভৃতি স্থানেও ক্রয় বিক্রয় হতে দেখা গেছে।

আশ্চর্য। সারা বিশ্বেই বুঝি এদের লোক রয়েছে।

ম্যাডাম উয়ং-এর সংগঠন এমনই দৃঢ় এবং মজবুত ভাবে গঠিত যে এই সব অভিযানে তাকে স্বয়ং খুব কমই যেতে হয়।

সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে উন্নতিশীল জাপানী ধনী সওদাগর শ্রেণীর প্রতিই বেশী নজর ম্যাডামের।

সরাসরি তাদের প্রতিই জলদস্যুতা করা হয় সমধিক।

অবশ্য ম্যাডামের রাজনৈতিক এবং ব্যবসায়িক চোখ সদা সর্বদা নিবদ্ধ রয়েছে হংকং-ম্যাকাও-সিঙ্গাপুর এবং ম্যানিলার দিকে।

বেশী দিনের কথা নয়ঃ কুয়াংসী শিপিং কোম্পানি দেড় লক্ষ ডলার দাবি করে তাদের জাহাজের 'নিরাপত্তা' গ্যারান্টি দেওয়া এক বেনামী পত্র পেল।

কোম্পানী এ অবৈধ নির্দেশ মানতে রাজি নয়।

ফলে, এর পরই ঐ কোম্পানীর এক জাহাজের দশ ফুট দূরে একটি সামুদ্রিক মাইন বিস্ফোরিত হয়ে জাহাজের ডায়নামো স্টিয়ারিং গিয়ার বিনষ্ট হয়ে ছিল।

কয়েক রাত্রি বাদে কুয়াংসী কোম্পানির অপর এক জাহাজে মাইন ফেটে সতেরজন যাত্রী ও নাবিকের প্রাণ নিল এবং জাহাজটিরও সাংঘাতিক ক্ষতিসাধন করলো।

অবশ্য ডাবড় ডাবড় জাহাজদের এড়িয়ে চলে বোম্বেটেরা, ওদের ঝামেলা অনেক।

যাত্রীবাহী জাহাজ আক্রমণ করতে গেলে যত সংখ্যক লোকবল প্রয়োজন হয় সাধারণতঃ তত ডাকাত দলে থাকে না।

সময় লাগে প্রচুব, লোক লাগে বহু, অনেক কিছু তল্লাসী ইত্যাদিতে ভয়ানক ঝুঁকি অথচ লাভ কম। কে যায় অমন ঝুটমুট কাজে।

অতএব পরিত্যক্ত ঐ পরিকল্পনা।

তাই সব সময় জলদস্যুরা ছোট বড় মাঝারি মাল-জাহাজেব প্রতিই লক্ষ্য রাখে।

বিশেষ করে পূর্ব চীন সাগর, টংকিং ও থাইল্যাণ্ডের উপসাগর, সিঙ্গাপুর ও জাকার্তার মধ্যবর্তী সমুদ্র এবং সাত হাজার ফিলিপাইনের দ্বীপাঞ্চল—মোটামুটি এই হল বোম্বেটেদের আক্রমণের উপযুক্ত স্থান সমূহ।

একটি বড় চমৎকার ঘটনা ঘটল ১৯১২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে।

ফিলিপাইনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল প্যালেইজ ম্যানিলার পাশে কুয়েজন সিটির জাঁকজমকপূর্ণ অট্টালিকায় একটি সভাপতিত্ব করেন।

সেখানে উপস্থিত প্রায় দুশো অতিথির মধ্যে ম্যাডাম সেনকাকু নাম্নী জনৈকা ঝলমলে বহুমূল্য পোষাক পরিহিতা এক জন চীনা মহিলাও ছিলেন।

তিনি সারাটা সন্ধ্যা বড় অঙ্কের বাজি ধরে তাস খেলে গেলেন। তাকে তাসের জুয়াও বলা যায়।

সেনর প্যালেইজ উক্ত মহিলা অতিথির শান্ত সমাহিত অচঞ্চল ভাব দেখে কৌতুহল বশত কাছে গিয়ে সহাস্যে প্রশ্ন করলেন: আপনি এত ঠাণ্ডা মাথায় এধরণের বহু টাকার বাজি ধরা গরম গরম তাস খেলছেন দেখে মনে হয় আপনি বুঝি বা ম্যাডাম উঙ্গং।

—আমিই ম্যাডাম উয়ং, চীনা মহিলাটি হাতের তাসের প্রতি নজর রেখেই স্মিত হাস্যে অতি সহজ ভাবে বলে উঠল, সেনকাকুটা হল আমার ছদ্মনাম।

শুনে প্রত্যেকেই এটাকে পবম রসিকতা মনে করে পরম কৌতুকে হেসে উঠেছিল সেখানে।

এ ঘটনার সাতদিন বাদে ম্যাকাও থেকে লেখা একটি অতি সংক্ষিপ্ত পত্র পেলেন সেনর। তাতে লেখা ছিল :

সেদিনকার মনোরম সন্ধ্যার জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

ইতি, ম্যাডাম উয়ং সেনকাকু

হ্যাঁ প্রকৃতই ম্যাডাম উয়ং।

সেনর প্যালেইজ-এর এ পত্র পেয়ে রোমাঞ্চ হল সন্দেহ নেই। পরে খোঁজ খবর নিয়ে দেখলেন যে প্রকৃতই ম্যাডাম সেনকাকুর অস্তিত্ব ছিল না।

পরে নিজে এবং অপরাপর অতিথিদের দিয়ে মহিলাটির চেহারার বর্ণনা ইণ্টারপোল-এ (আন্তর্জাতিক পুলিশ বিভাগ) পাঠিয়ে দিলেন।

ইণ্টারপোল কিন্তু ধাঁধায় পড়লো। কেননা কারুর বর্ণনার সঙ্গেই কারুর মিল ছিল না।

সেনরের পার্টিতে ম্যাডাম উয়ং !!

এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়বার পর দূর প্রাচ্যের বিভিন্ন নগরীর অভিজাত সোসাইটি সর্বসময়ে ভাবতে বসলো যে তারাও কোন না কোন পার্টিতে অজ্ঞাতসারে তথাকথিত ঐ ম্যাডামকে অভ্যর্থনা করেছে কিনা।

অসম্ভব নয়।

কেননা ম্যাডাম উয়ং বিভিন্ন নামে বিভিন্ন শহরে বন্দরে, সম্পত্তি বাড়ি কিনে রেখেছে।

সন্দেহ এড়াবার জন্য শোনা যায় ম্যাডাম কোথাও কোন পার্টিতে

গেলে তার কোন একজন বোম্বেটে পুরুষ সহকারীকে স্বামী সাজিয়ে নিয়ে যেত।

অবশ্য সেই লোকটির স্বামী সেজে পার্টিতে যাওয়া পর্যন্তই সার, তার বেশী কিছু সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছামাত্রই মৃত্যু অবধারিত। কেননা ম্যাডামের পুরুষ সম্পর্কে আর কোন মোহ অবশিষ্ট নেই।

ম্যাডাম উয়ং নাকি স্বজাতি মেয়েদেরও ঘৃণা করে থাকে।

সেই কারণে কতগুলি পতিতালয় পরিচালনার মধ্যেও সে জড়িত ছিল।

কেননা দেহ এবং মনের দিক থেকে অপর নারীকুল বেইজ্জত হচ্ছে, একথা শুনলে বা জানলেও সে আন্তরিক উল্লাস অনুভব করত।

এ কারণে শ্বেতাঙ্গ নারী ব্যবসায়েব মধ্যেও নাকি সে লিপ্ত আছে শোনা যায়।

ফরাসীদের অধীন ইন্দোচীনের সময়েও ঐ হোয়াইট স্লেভ-এর ব্যবসা যেমন বোলবোলাও ছিল এখনও নাকি তেমনি চলছে।

ম্যাডাম উয়ং এর দলে কত লোক কাজ করে?

হংকং-এর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মতে প্রায় ৩০০০।

পর্তুগীজরা বলে ৮০০০ এর কম নয়।

এ ছাড়া আছে দিগবিদিকে অসংখ্য চর। জাপানীদের মতে ম্যাডামের জাহাজ ও নৌকো আছে অন্ততঃপক্ষে ১৫০টি।

১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে জাপানী কর্তৃপক্ষ সহসা উল্লসিত হয়ে উঠল।

যাক, এবার ম্যাডাম উয়ং সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সব সংবাদ পাওয়া যাবে। কি ব্যাপার?

কারণ হল ম্যাডামের একজন নেতৃস্থানীয় সহকারী কোবে-তে কাষ্টম পুলিশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে বলে জানিয়েছে। এবং স্বতপ্রবৃত্ত হয়েই।

অতএব জাপানী কর্তৃপক্ষের উল্লসিত হবার কারণ আছে বৈকি!

কিন্তু হায়।

যথাকালে সে লোকটি অ্যাপয়েন্টমেণ্ট রেখেছিল ঠিকই। কিন্তু তখন তার দুটি হাত বাহুমূল থেকে কাটা। আর কাটা তার সম্পূর্ণ জিভটি। লিখে জানাতেও পারবে না, না পারবে মুখে বলতে।

বিশ্বাসঘাতকের প্রতি চিবাচবিত চীনা শাস্তি এটি।

লোকটি কযেক সপ্তাহ এ অবস্থায বেঁচে ছিল বটে কিন্তু সে কোন সংবাদ দিতে পারেনি, কেননা তাব লেখবাব বা কথা বলবার দুই শক্তিই ম্যাডাম কেড়ে নিয়েছিল দুটি হাত কেটে আর জিভ কেটে নিযে।

ইতিমধ্যে এক জোব গুজব রটলো দিগবিদিকে।

১৯৬৭ খৃষ্টাব্দেব গ্রীষ্মকালে ম্যাডাম উয়ং নাকি কিছুকাল ইয়োবোপের ফবাসী রিভিয়েরায় কাটিয়ে গেছে।

একথাও অনেকেব মুখে শোনা গেছে যে ৬৪ র আগস্ট মাসে জনৈকা ঝলমলে ধনী এবং অভিজাত চীনা মহিলা এবং তাঁর শান্ত-শিষ্ট স্বামীকে মন্টিকার্লোতে দেখা গেছে।

মহিলাটি নাকি জুযার ক্যাসিনোতে ভীষণ ভাবে হেরেছেন। ম্যাডাম উয়ং-এর পক্ষে জুয়ায় হেরে যাওয়াটা কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হয়।

অবশ্য ঐ ধরণের মোটা অঙ্কেব হারও ম্যাডামের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের কাছে সমুদ্রে এক চামচে জলের সমান।

ম্যাডাম উয়ং মনে হয় দুর্ভেদ্য, অভেদ্য এবং অবধ্যও বটে।

বয়েস এখনো পঞ্চাশের নীচে। তন্বী-কর্মঠ দেহ, চঞ্চল স্বভাব, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না, দুর্দান্ত বেপরোয়া ও সাহসী মহিলা ম্যাডাম উয়ং দূর প্রাচ্যে একটা কিংবদন্তীর মত হয়ে গিয়েছে।

একটি ইন্সিওর কোম্পানী বড় সুন্দর এক লাইন লিখে রেখেছে-ম্যাডামের সম্বন্ধে তাদের ফর্মে।

তাদের শিপিং পলিসিতে: "দৈব বা ম্যাডাম উয়ং-ঘটিত

দুর্বিপাকে" (for acts of God and Madam Wong) কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না বলে উল্লিখিত ছিল।

একজন নিষ্ঠুরা নৃশংস স্বভাবের জলদস্যুরমণীর পক্ষে এ এক অদ্ভুত প্রশংসাবানী এবং বিশেষণও বটে।

তিন

গাঢ়-নীল-জল ভূমধ্যসাগরের আকাশে চাঁদ যখন ঢাকা পড়ে যায় কাজল কালো মেঘে, সে সময় বেরিয়ে আসে লালসাময়ী বেপরোয়া ডগমগ-যৌবনের এক রূপসী যুবতী তার দুর্দান্ত ও বিচিত্র দলবল নিয়ে।

অতঃপর তারা সেই জল-ছল-ছল অন্ধকারে প্রায় নিঃশব্দে এগিয়ে চলে মেসিনা প্রণালীর লুটের মাল অধ্যুষিত ভয়ংকর এক অঞ্চলের দিকে।

কে এই মেয়ে? সেরাফিনার কথাই বলছি।

সেরাফিনা ডোনেল্লি। ইতালীদেশের মেয়ে।

কি বিশেষণে অভিহিত করা যায় এই অনন্য সাধারণ যুবতীকে?

সুন্দরী ডাকাত? রূপসী স্মাগলার? অপরূপা খুনে? না কি লালসাময়ী গণিকা?

একাধারে এ মেয়ে বুঝি সবই। সারা বিশ্বে এই দুর্দান্ত মেয়ে সেরাফিনার তুলনা বুঝি প্রকৃতই বিরল।

এই ভয়াবহ মক্ষীরাণী, স্মাগলার রাণা শ্বেতাঙ্গিনী ইতালীয় বিভীষিকার কার্যাবলী যেমন ভয়ংকর, এর জীবন কাহিনীও তেমনি রোমাঞ্চকর।

এবার তাহলে এই বোম্বেটে মেয়ের কাহিনীটি যথাযথ আরম্ভ করা যাক:

* * * *

উনিশশ' উনষাট খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের চাঁদহীন এক অন্ধকার রাত।

ভূমধ্য সাগরের মেসিনা প্রণালীতে সিসিলির উপকূলের পাশ দিয়ে চলেছে দেখা গেল একটি কেবিনওয়ালা ডিজেল মোটর বোট।

সেটি অগ্রসর হচ্ছিল মন্থর গতিতে শিলাসংকুল বিপজ্জনক তীরভূমির দিকে।

তীরের কাছে অবস্থিত মাঝারি উচ্চতার এক জলজ পাহাড়ের ছায়ায় এসে থেমে গেল মোটর বোট। স্তব্ধ হল ইঞ্জিনের ধকধক আওয়াজ।

আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল বোটের অনতি উচ্চ রেলিং টপকে কোমর জলে ঝপাঝপ নেমে পড়লো একদল তাজ্জব নাবিক।

তাজ্জব বলা হচ্ছে এ জন্যে যে তারা সবাইই মেয়ে এবং যুবতী মেয়ে।

বলা বাহুল্য এরা যে স্মাগলার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কোমর জল ঠেলে গিয়ে পৌছলো তীরভূমিতে।

তারপর মেয়েগুলি তীরে রক্ষিত বাক্স বাক্স আফিঙ জাতীয় মাদকদ্রব্য, জুয়েলারী, বাক্স নোট প্রভৃতি ভাসিয়ে নিয়ে এল মোটর বোটের কাছে।

সেখানে, বোটের উপরে থাকা দুটি মাত্র ষণ্ডাজাতীয় পালোয়ান পুরুষ সেই বাক্সগুলিকে নিমেষমধ্যে তুলে নিল ডিজেল বোটে।

অকস্মাৎ শিলাগঠিত তীরভূমিতে শোনা গেল ইতালীয় পুলিশ এর মার্চ করে আসা বুটের মচমচ আওয়াজ। আর সঙ্গে সঙ্গে তারা শক্তিশালী ইলেকট্রিক টর্চ ফোকাস করে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা ডিজেল বোটকে চরম আলোকোজ্জ্বল করে তুললো।

এবং সেই আলোতে এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠলো পুলিশদলের।

এমন বিস্ময়কর দৃশ্যের জন্য তারা বুঝি সরাসরি প্রস্তুত ছিল না।

কেবিনের ছাদে, পাইলট হাউসের সামনে মাস্তুলটাকে এক হাতে ধরে, হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে অপরূপ রূপসী এক তরুণী কন্যা।

দুরন্ত সমুদ্র বাতাসে তার ভ্রমর কালো হালকা চুলগুলি দিক্ বিদিকে উড়ে উড়ে উঠছে আর নামছে।

পাথরে তৈরী একটি কমণীয় রমনী মূর্তি যেন। এ দেবী না দানবী। দানবীর চেহারাগুটি এমন নয়নমনোহর হয়?

কিন্তু এ দৃশ্য বেশীক্ষণ উপভোগ করবার সময় পেলনা পুলিশ দল।

চোখের পলকে তরুণীর নিখুঁত নিশানায় তার হাতের কালান্তক পিস্তল থেকে পর পর দুটি গুলি বেরিয়ে তীর ভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকা ইলেকট্রিক টর্চলাইট বাহকদ্বয়কে প্রাণহীন করে ফেলল।

অতএব—

পুলিস দল বিপদবুঝে যঃ পলায়তি···পন্থায এক লাফে পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচালো।

সেই সুযোগে যণ্ডাগুণ্ডাজাতীয় বাদামী রঙের মানুষ দুটো কোমর জলে থাকা অর্ধনগ্ন মেয়েগুলিকে টপাটপ বোটে তুলে নিল।

সমুদ্র জলে একটা বিপুলাকার "ভি" আকৃতির ফেনা তুলে মোটর বোটটি গোঁ গোঁ শব্দে ইতালীর মূল ভূখণ্ডের দিকে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ডিজেল ইঞ্জিনের শব্দ দিগন্তে মিলিয়ে যেতে তবে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় ইতালীয় পুলিশদলেরা ভরসা পেল পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসার।

দুটি মৃত দেহ তুলে নিল তারা।

এবার সেই পুলিস-দলপতি একটি সিগারেট ধরাতে ধরাতে ক্ষুব্ধ হতাশ কণ্ঠে অন্ধকার সমুদ্রের পানে তাকিয়ে বলে উঠল, হারামজাদী। সেই বজ্জাত সেরাফিনা আর তার বেশ্যার দলটা ফের এখানে হানা দিয়ে গেল। ব্যাস্টার্ড, সোয়াইন···।

শুনলে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু বিশ্বাস না করেই বা উপায় কী!

এই মেসিনা প্রণালীর দুই তীরে অবস্থিত মুখোমুখি থাকা শিলাসংকুল উপকূলভাগের ইতালী ও সিসিলির মধ্যে এ ধরণের ঘটনা আকচারই ঘটেছিল এককালে।

প্রাচীন যুগের কর্শিকা ও সিসিলির জলদস্যুদের কার্যকালের পর থেকে এই ধরণের সুসংগঠিত কুখ্যাত খুনে স্মাগলারদের এমন ভয়ংকর বোম্বেটে দল আর কখনো দেখা যায় নি।

বর্তমান যুগে জলদস্যুদের সুযোগ সুবিধা বেড়েছে।

তারা পাল তোলা জাহাজের পবিবর্তে ডিজেল ইঞ্জিনযুক্ত মোটর বোটে দ্রুত বিচরণ করে থাকে। আব তাদের সঙ্গে থাকে গাদা বন্দুকের পরিবর্তে সর্বাধুনিক ব্রেনগান এবং ব্রেডা সাব-মেশিনগান।

সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার হল এই যে এই জলদস্যুতার মালিক হল কিনা একজন রূপসী কামাতুরা হিংস্রস্বভাবা উদ্ভিন্ন যৌবনা বেপরোয়া গণিকা।

তাজ্জবের উপর তাজ্জব, এই সেরাফিনার দলের সবাই মেয়ে।

সঙ্গে রাখা ষণ্ডাগুণ্ডা প্রকৃতির দুজন পুরুষমানুষ শুধু ভারী ভারী মাল তোলবার দৈহিক শ্রমের কাজের জন্য রয়েছে।

আর অবসর সময়ে এই দুজন পুরুষের দ্বারা বুঝি লালসাবৃত্তি চরিতার্থ করার মানসে তাদের দলভুক্তি।

ইতালীর এই প্রখ্যাত বা কুখ্যাত চোরা চালানকারিণী যুবতীটি প্রকৃতই বুঝি অনন্যা।

সারা বিশ্বের আণ্ডারওয়ার্ল্ড ক্রিমিনালদের মধ্যে এ মেয়ের তুলনা এবং জুড়ি মেলা বোধ করি ভার।

সেরাফিনা ডোনেল্লি।

বয়েস ঘটনাকাল ১৯৫৯-তে ছিল ২৮ বছর। চোখ ঝলসানো রূপসী এই মেয়ে।

কোথায় যেন একটা দুর্নিবার আকর্ষণ আছে ওর হাবভাব চলন বলন আচার আচরণ ও ব্যবহারে।

সিনেমা অভিনেত্রীদের মত দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারিণী এই যুবতীর মাপ ছিল ৩৮-২৫-৩৬।

হলে হবে কি এ এক কাল কেউটে নাগিনীকন্যা। অমনফুলের মত আকৃতিব কন্যার প্রকৃতি কিন্তু বড়ই ভয়ংকর।

মনেব মধ্যে বুঝি দয়ামায়া প্রীতি বলে কোন বস্তু নেই। হিংস্র স্বভাবের এই নারী যে কোন কুখ্যাত পুরুষ ক্রিমিনালের চেয়ে কোন অংশেই কম নিষ্ঠুর নয়।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রচুর গণিকাপল্লীর সকল মালিকানা থেকে যখন এই সেরাফিনা দক্ষিণ ইতালী ও সিসিলির মধ্যে লক্ষ কোটি টাকার নিরবচ্ছিন্ন চোরা চালানের কারবারে অশুভ পদার্পণ করল, তখন থেকেই ওখানকার সাংবাদিকদের দ্বারা :

"সিসিলির স্মাগলার রাণী! নামে প্রখ্যাত বা কুখ্যাত হয়ে গেল সে।"

অতঃপর ধাপে ধাপে উন্নতির সোপানে আরোহণ।

এক বছর অর্থাৎ ১৯৫৯-এর মধ্যেই স্মাগলিং-এ তার একচেটিয়া অধিকার বর্তে গেল।

শুধু তাই নয়, তার অধীনে আরও কয়েকটি গলাকাটার দল যাবতীয় স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক উপায়ে বিচিত্র সব অবৈধ ব্যবসা চালিয়ে যেতে লাগলো।

কোন কাজই এদের অসাধ্য নয়।

লোকাপহরণ, ডাকাতি, নরহত্যা থেকে গভীর সমুদ্রে জলদস্যুতা প্রভৃতি যাবতীয় কুকর্মেই এরা প্রথম শ্রেণীর ক্রিমিনালরূপে নিজেদের প্রমাণিত করেছে।

আর সমস্ত কিছুর সর্বাধিনায়িকা হল কুহকিণী তরুণী এই সেরাফিনা ডোনেল্লি।

ইতালীর নামকরা কনজারভেটিভ সংবাদপত্র হল 'ইল গেজেটিনো" ;
সে পত্রিকা একবার অত্যন্ত ক্ষুব্ধভাবে সম্পাদকীয়তে লিখলো :

"আণ্ডারওয়ার্ল্ডের এই কুখ্যাত যুবতী ডিক্টেটর সেরাফিনা ও তার খুনে মেয়ের দল দেশে বিদেশে যথেচ্ছাচার করে বেড়াচ্ছে। খুনখারাপি, চুরি, ডাকাতি, বোম্বেটেপনা কিছুই বাদ যাচ্ছে না। এটা বড়ই পরিতাপের, অবিশ্বাসের এবং বিরক্তিকরও বটে যে দেশের সরকার এই বদমাইশ দলকে আজও গ্রেপ্তার করে ধর্মাধিকরণে উপস্থিত করে শাস্তি বিধান করতে সক্ষম হচ্ছে না।"

কিন্তু সেরাফিনা ধরা পড়ে না। এর রহস্যটা কি? কারণই বা কি?

দক্ষিন ইতালীর পুগলিয়া নামক রাজ্যের ক্রিমিনাল ইনভেস্টি-গেশান অফিসার কমিশারিও রাগগিয়েরো ছ্য প্রাতি, যিনি বছরের পর বছর ধরে সেরাফিনার কুখ্যাত দলটিকে সমূলে ধ্বংস করবার আন্তরিক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি বলেন :

"এই কুখ্যাত মেয়েটা সেই ১৯৫৪ থেকে প্রতি বছর গড়পড়তা সাড়ে পাঁচ থেকে সাড়ে ছয় কোটি টাকার মত শুধুমাত্র স্মাগলিং থেকেই কামাচ্ছে। এই দলটি কমপক্ষে ৫৫টি জলে স্থলে হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী। নিহত মানুষদের মধ্যে আছে পুলিশ, ওদের সন্দেহ করা ইনফর্মার এবং সাধারণ নাগরিক যারা অপহৃত হয়ে মুক্তিপণ দিতে অস্বীকার করেছে। সিসিলি এবং দক্ষিণ ইতালীতে স্থলভাগে এবং সমুদ্রে কুকর্মে রত এদের দলের মধ্যে আছে ৬৫০ জন মেয়ে এবং ১০০ থেকে ১৫০-এর মত গুণ্ডাজাতীয় পুরুষ।"

কমিশারিও প্রাতি আরও বলেন যে এদের অধিকাংশকেই নাকি ওরা চেনেন এবং জানেন এরা কি কি কুকর্মে লিপ্ত রয়েছে।

কিন্তু মুস্কিল হল এক জায়গায়। এদের ধরা হলে সাক্ষী পাওয়া যায় না। মৃত্যুভয়ে কেউ এদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে সাহস করে না। সাক্ষ্য প্রমান এই ভাবে নিখোঁজ হয়ে যায়।

জানিনা কি রহস্য আছে এর পেছনে, স্থানীয় জজেরাও কোন এক অজ্ঞাত কারণে এদের প্রতি লঘুদণ্ড দিয়ে থাকেন। অপর দিকে আসামীর স্বপক্ষে বহু নরনারী নিশ্ছিদ্র লৌহবর্মের ন্যায় অ্যালিবাই উপস্থিত করে সাক্ষ্য দেয়······।

বিচিত্র ঘুষ, ভীতিপ্রদর্শন বা নানাবিধ চাতুর্যকলা, এসবে ভাল কাজ হয় এটা ঐ দলটি ভাল ভাবেই জানে। এবং উক্ত সব বস্তুর প্রয়োগে সুচতুরা কৃষ্ণকেশী সেরাফিনা কখনো বিন্দুমাত্র ত্রুটি করে না।

বরং বলা যায় প্রয়োজনাতিরিক্তই সে দিয়ে থাকে।

সবচেয়ে বড় অস্ত্র তার, দেহ। সুলক্ষিত যৌবনমদে মত্তা দেহ-প্রহরণ। এই অস্ত্রেই অধিকাংশ বাধা সে অবলীলায় অতিক্রম করে যায়। রক্তমাংসের অধিকাংশ মানুষ কামের দাস।

সেই কামকেলির নিখুঁত শিল্পী এই দস্যু যুবতী প্রয়োজন বোধে যথাকালে এবং যথাস্থানে নিজ সুঠাম দেহলতার বিনিময়ে কাজ হাসিল করে বেরিয়ে যায়।

উদগ্র যৌবনময়ী এই নারীদস্যু খোলাখুলি ভাবেই দম্ভভরে বলে বেড়াত যে বহু বড় বড় বাঘা অফিসারদের নাকি উক্ত দেহদাওয়াই দিয়ে বশীভূত করেছে সে।

কুলোপানা চক্করকে ফুসমন্তরে বশীভূত করার মত বশীভূত করে করে ফেলেছে সে অনেক ক্ষমতাশালী মাননীয় ধরণের মানুষদেরও।

দলের মেয়েরা সকলেই কাঁচা বয়সের এবং অধিকাংশই রূপসী। তারাও সদা পেছু লাগা আইনকে কাঁচকলা দেখিয়েছে তাদের "মক্ষী-রাণী" সেরাফিনার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ স্থানীয় মানুষের অঙ্কশায়িনী হয়ে।

এর মত দাওয়াই বুঝি সংসারে আর নেই।

অঘটন ঘটন পটিয়সী ঔষধ।

মাঝে মাঝে এই সব দাগী মেয়েরা ব্ল্যাকমেইলের মহৎ উদ্দেশ্যে

বহু রাজনীতিক, প্রসিকিউটার, জজ ও তদন্তকারী মানুষদের দেহ-প্রহরণের আঘাতে স্বপক্ষে এনে কাবু করে ফেলেছে।

জনৈক প্রাক্তন কাস্টম অফিসারের মুখে ঐ কুখ্যাত দলের একটি মেয়ের কীর্তি কাহিনী জানা যায়।

একদা ঐ অফিসারটি ভূমধ্যসাগরের উপকুলে অবস্থিত তার অফিস ঘরের জানালা দিয়ে নীল সমুদ্রের পানে আনমনা হয়ে তাকিয়ে ছিলেন।

সহসা সেখানে এসে উপস্থিত হল সতের আঠারো বছর বয়সের অপরূপ সুন্দরী একটি মেয়ে।

মেয়েটির হাতে একটি দামী ও দুস্প্রাপ্য মদের বোতল।

অফিসারটির মন্তব্য : আরে মশাই আমরা তো রক্তমাংসেরই মানুষ, সাধু সন্ত তো নই।

অতএব তিনি যথারীতি মেয়েটির প্রলোভনে ডুবে গেলেন, একে দুস্প্রাপ্য সুরা, তার উপর দুর্লভ কিশোরী বালা…অতএব।

অতএব আনন্দ স্ফূর্তির পরে বোঝা গেল মেয়েটির সেথায় আগমনের আসল কারণ।

কোকিলনিন্দিত কণ্ঠে অষ্টাদশী মিনতি জানায়, কাছাকাছি ডক-এর এক গোপন স্থানে কিছু দুর্মূল্য ক্যামেরা রয়েছে। স্যার অনুগ্রহ করে মালগুলি চালু করবার জন্যে আপনার মঞ্জুরের কয়েকটা ষ্ট্যাম্প-সহ অনুমতিপত্র চাই।

মেয়েটির আনা দামী মদের বাকি অংশটা এক চুমুকে শেষ করে কাষ্টম অফিসার রূপসী কিশোরীকে সবলে পুনরায় নিজে অঙ্কে তুলে নেন।

অতঃপর মেয়েটির আকাঙ্ক্ষিত-স্টাম্পসহ-কাস্টমের অনুমতি-পত্র তুলে দেন তার হাতে।

—আর রক্তমাংসের মানুষতো বটে…কি আর করা যাবে বলুন।

এর ফলস্বরূপ অবশ্য সেই লোভী অফিসারটির চাকুরী যায়।

কিন্তু আজও সেইদিনের মধুর স্মৃতিচারণের সময় জুলুজুলু নেত্রে অফিসারটি বলে উঠেন, উঃ ব্রাদার কী আর বলবো…একেবারে পরীর বাচ্চা। কী চেহারা…কী মুখ…কী…।

জন্মভূমি ইতালীও বুঝি কখনো কল্পনা করতে পারেনি যে সেরাফিনার মত একটি সন্তান একদা তাব বক্ষে বিচরণ করে ফিরবে

—আরে বাবা ওটা তো ছিল একটা সম্তাদবেব অতি নগণ্য 'পুত্তানা' বেশ্যা, নেপল্সের ঘাগী এক পুলিস ইন্সপেক্টব বিরক্তিভরে বলে ওঠেন, কিন্তু যে কোন ধরনের অবৈধ জাল জুয়াচুরীতে ঐ শয়তানী ছিল যাকে বলে পুরো জিনিয়াস। ঐ একটা সামান্য দেহ পশারিণী মেয়ে যেভাবে বিশাল আকারে এদেশে স্মাগলিং বোম্বেটেগিরি ইত্যাদি করে যাচ্ছে তা বোধ করি দুনিয়াব বড় বড় বদমাইশদেরও কল্পনায় আসবে না।

দ্রুতগামী মোটরবোট সমুহ নিয়ে সেবাফিনার বিভিন্ন দলেবা ট্যাক্সহীন সিগারেট, হীরে, অবৈধ মাদকদ্রব্য প্রভৃতির বিরাট পরিমান চালান, ইতালীর নিজন পাণ্ডববর্জিত উপকুলের স্থানে স্থানে রাত্রির অন্ধকারে নামিয়ে দিচ্ছে অহরহ।

এইসব ক্রিয়াকর্মেব মুখে মাঝে মাঝে উপকুল প্রহরী 'গার্ডাকোষ্ট' -এর লঞ্চের মুখোমুখি হতে হয় কিন্তু অবিরাম গুলিবৃষ্টির মুখে পড়ে পুলিসদল সব সময়ই পালিয়ে বাঁচে।

এইভাবে মাঝে মাঝে দুপক্ষে দেখা হয়ে থাকে। তবে এই মেয়ে দস্যুদের হাতে পর্যুদস্ত হয়ে পুলিসলঞ্চ সদা সর্বদাই রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়।

এদের হাতে প্রায়ই পুলিসদলের কিছু লোকের মৃত্যু হয়।

অথচ আশ্চর্য, কখনো কোন গ্রেপ্তার হতে দেখা যায়না।

সেবার ডোমিনিক প্যাগানোর মত একজন অতি পরাক্রমশালী মানুষের মৃত দেহ পাওয়া গেল সিসিলির এক গলিপথে।

ছুরিকাহত দেহের একান থেকে ওকান পর্যন্ত গলাকাটা।

কি তার অপরাধ? অপরাধ হল প্যাগানো নাকি বলেছিল:

—ঐ ডাকাত স্ত্রীলোকটাকে একেবারে টুকরো করে শেষ করে ফেলবো। তবেই দেশটা জুড়োবে।

এই দম্ভই তার কাল হল। অপঘাতে মরে পড়ে রইলে সিসিলির এক গলিপথে বীভৎস লাশ।

অথচ এর পেছনে যে সেরাফিনা রয়েছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাকি ছিল না। কিন্তু তাকে কোন অজুহাতেই এ ব্যাপারে ধরবার জো রইল না।

কেননা হত্যাকাণ্ডের স্থান থেকে কয়েকশ মাইল দূরে তখন সেরাফিনা।

একডাকে তার স্বপক্ষে পাওয়া যাবে শতশত সাক্ষী। সেরাফিনার নির্দোষিতা সম্পর্কে তারা হলপ করবে।

সেরাফিনা এই জলদস্যুতায় অধিষ্ঠাত্রী হবার পর এই ধরণের অসংখ্য হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কিন্তু আইনের দিক দিয়ে এমন কোন প্রমান কর্তৃপক্ষ কখনোই সংগ্রহ করতে পারেনি যার বলে ওকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায়। এবং শাস্তি বিধান করা যায়।

সেরাফিনা জীবনে মাত্র একবার গ্রেপ্তার হয়েছিল।

সে অনেককাল আগেকার কথা।

হায়, সেই গ্রেপ্তারই কাল হল। সেই গ্রেপ্তারের ফল স্বরূপ এই মেয়ে এই দস্যুতার জীবন গ্রহণ করলো। কিছুটা আক্রোশ এবং প্রতিহিংসাবশত।

তখন ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ।

সিসিলির প্যালারমো পুলিশের কাছে মাঝবয়েসী কয়েকজন ব্যবসাদার নালিশ জানালো বিশেষ একটি মেয়ের বিরুদ্ধে।

মেয়েটির বয়েস ভরা ষোল। নাম, সেরাফিনা ডোনেল্লি।

কি তার অপরাধ ?

মেয়েটা নাকি ঐ সব মাঝবয়েসী ব্যবসাদারদের রাস্তা থেকে দর দস্তুর করে নিয়ে একটা ভাড়া করা ঘরে তোলে এবং পনের টাকার বিনিময়ে দেহদান করে।

কিন্তু পরক্ষণেই সে মেয়ে একশ টাকা দাবী করে। নচেৎ ভয় দেখায় যে উক্ত টাকা না দিলে এই সব ব্যবসাদারদের পত্নীদের কাছে এই ব্যাভিচারের কথা সে ফাঁস করে দেবে। রীতিমত ব্ল্যাক-মেইল।

সিসিলির প্যালারমো পুলিশ বুঝি সাংঘাতিক একটি ভুল করে বসলো।

তারা ওকে এক রাত্রে এক মাঝবয়সী খদ্দেরকে আনন্দদান-কালীন শয্যা থেকে অর্ধবিবস্ত্র অবস্থায় তুলে নিয়ে এল পুলিশ স্টেশানে।

তারপর হাজতবাস পরে আদালত।

সাজা হল, ছয় মাস কারাদণ্ড।

এই গ্রেপ্তার ও সাজা না হলে হয়ত নগন্যা এক গণিকা রূপেই সেরাফিনা বাকি জীবন রোগে শোকে দুঃখে দৈন্যে কাটিয়ে দিত।

কিন্তু তা হল না।

এই গ্রেপ্তার ও জেলের প্রতিহিংসায় সে নেমে গেল এক ভয়াবহ পথে, ভয়াবহ কাজে।

জন্ম নিল নতুন এক দুর্দান্ত নারী দস্যু।

যার অসাধ্য কুকর্ম সংসারে আর কিছু নেই।

পরবর্তীকালে দেশের শাসন ও পুলিশ কর্তৃপক্ষকে হিমশিম খাইয়ে বেড়াতে লাগলো রূপসী এই স্মাগলিং রাণী।

বিগত বিশ্বযুদ্ধকালীন অনাথা মেয়ে এই সেরাফিনা। জেলে বসে বসে সারা দুনিয়াকে সে গালাগাল দিল, অভিশাপ দিল, অকথ্য খিস্তি খেউড় করতে লাগল।

ওয়ার্ডারদের মুখে থুথু ছিটিয়ে বলতে লাগলো, শুনে রাখ তোরা, সব বেটাকেই আমি শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব। এই বলে রাখলুম। একবার জেল থেকে বেরিয়ে নিই।

জেল থেকে বেরিয়ে সে চীৎকার করে শাসাতে থাকল, আমি দেশের যাবতীয় পুলিজিয়াদের (পুলিসদের) অতিষ্ঠ করে তুলব। আর তার সঙ্গে চরম শিক্ষা দেব পুলিশদলের সাহায্যকারী টিকটিকি হারামজাদাদের।

জেল থেকে বেরিয়ে সেরাফিনা প্যালারমো ছেড়ে চলে গেল সিসিলির পর্বতসংকুল অঞ্চলে।

সেখানে আস্তানা গেড়েছিল তদানিন্তন চোর-ডাকাত-বদমাইশদের দল।

গিয়েই সে প্রথমে একটা দলে ঢুকে পড়লো।

এরপর গেল কুখ্যাত ডাকাত 'ব্যাণ্ডিটো' গিউলিয়ানোর দলে। তার রক্ষিতা হিসেবে কাটালো কিছুদিন।

আবার দল পালটালো। বাবুও পালটালো।

শোনা যায় ঐ পার্বত্য গুহা অঞ্চলে থাকাকালীন ইতিহাস সেরাফিনার জীবনে সর্বাধিক ব্যাভিচারের ইতিহাস।

এই নষ্টচরিত্রা নারীর যৌনক্ষুধা ছিল দানবীয়।

পুরুষের পর পুরুষ হার মেনে সরে গেছে এই সর্বগ্রাসী সর্বনাশী-দুষ্টাকন্যার শারীরিক সান্নিধ্য থেকে। পৈত্রিক প্রাণ বিনষ্ট হবার দাখিল এর চাহিদার কাছে।

কামার্ত এই যুবতী ক্লান্তিহীন শ্রান্তিহীন।

পরিহাস করে বলা হত শোনা যায় যে, যে কোন পেশীবহুল বলবান যুবক যদি ওর সঙ্গে মাসাধিককাল বসবাস করতো তার মৃত্যু হবে অবধারিত।

অবশ্য অনেক দুষ্কৃতকারীর মতে, সে মরণ নাকি স্বর্গ সমান করে দিত এই কাম কলাবতী যুবতী কন্যা।

পর্বতে লুকিয়ে থাকা এই দস্যুদলের পেছনে পেছনে লেগে থেকে দেশের পুলিশ বিভাগ প্রায় নাজেহাল হয়ে গিয়েছিল।

এরপর একদা এক মত্তকায় 'ব্যাণ্ডিটো' পিউলিয়ানোকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে খতম করতে সমর্থ হল।

এতাবৎকাল সেরাফিনা ডাকাতদলকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে।

সে ছিল দস্যুদলভুক্তা আদর্শ নারী।

সে নজর রাখত শত্রুপক্ষের (পুলিসদের) প্রতি। চরের কাজ করত। খোঁজ খবর আনত।

এবং দলমত নির্বিশেষে ডাকাতদের অঙ্কশায়িনী হত।

১৯৫০-এ প্রখর বুদ্ধিমতী এই সেরাফিনার দস্যুদলের রক্ষিতার জীবনে বুঝি অরুচি এসে গেল।

কিছুদিনের মধ্যেই সে পার্বত্য অঞ্চল থেকে নিচে নেমে চলে এল একটি শহরে। সঙ্গে নিয়ে এল ডাকাতির কিছু ভাগ, প্রায় লাখ খানেক টাকা।

ইতালীর সর্বদক্ষিনের বুট-এর মত আকৃতির অংশ যেখানে শেষ, তার পরে মেসিনা প্রণালী পার হলে সিসিলির যে শহরটি প্রথমে পড়ে তার নাম মেসিনা।

আড়াই লক্ষ অধিবাসীর ছোট শহর সেটি।

সেই শহরে এসে উপস্থিত হল সেরাফিনা।

এবার নতুন ব্যবসায়ে নামল। ইতালী এমন কি সারা ইওরোপের সর্বকনিষ্ঠা বাড়িওলী রূপে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে সেরাফিনা ৮।৯টি মেয়ে নিয়ে একটি বেশ্যালয় খুলল সে এই মেসিনা শহরে।

শোনা যায়, নিজে মালিক হলেও সুন্দর যুবা দেখলে মেয়েদের বাদ দিয়ে নিজেই সে এগিয়ে যেত সেই খদ্দেরের পরিচর্যায়।

গ্যালপে উন্নতি হতে লাগলো এই দেহ ব্যবসা।

সেরাফিনা স্বয়ং এবং তার পরিচালিত দেহপসারিনীদের কাম-চাতুর্যকলার পরিচয় পেয়ে অজস্র রসিক পুরুষের আগমন হতে থাকল ওর আড্ডায়।

ক্রমে একটি আলয় থেকে বেড়ে চার চারটি বেশ্যালয়ের মালিক হয়ে উঠল সুন্দরী যুবতী সেরাফিনা।

যুবতী বাড়িওয়ালী।

বহু মেয়ে খাটতে লাগলো ওর অধীনে।

একদিকে যেমন এ ব্যবসা প্রচুর আমদানীর ব্যবসা, তেমনি এতে ঝামেলাও অজস্র। সেসবের মোকাবিলা করবার জন্য দানব-সদৃশ কিছু গুণ্ডা পুরুষও পুষতে হল তাকে।

এই ভাবেই বুঝি অজ্ঞাতসারে ওর ভবিষ্যৎ জলদস্যুতার দল গঠিত হতে লাগলো তিলে তিলে।

তিরিশটি উদ্ভিন্ন যৌবনা তরুনী আর পাঁচ ছয়জন ইয়া জোয়ান মার্কণ্ডমার্কা পুরুষ ওর অধীনে কাজ করতে লাগলো অহোরাত্র।

ঠিক কি ভাবে সেরাফিনা প্রথম স্মাগলিং-এ নামল তা অবশ্য সঠিক জানা যায় না।

তবে এর পর কি কি ঘটল তা জানতে হলে ইতালীয় জীবন-যাপন ও অপরাপর ব্যাপার কিছু বলতে হয়।

প্রথমত: ওদেশে যাবতীয় বানিজ্যিক বস্তু সামগ্রীর ওপর ডিউটি এবং ট্যাক্স বড় সাংঘাতিক রকমে বেশী।

অথচ মাইলখানেক সমুদ্রের ব্যবধানে অবস্থিত ইতালীয় দ্বীপ সিসিলি কিন্তু কতকাংশে স্বশাসিত অঞ্চলের মত সুখ সুবিধা ভোগ করে থাকে।

মূল ভূখণ্ডের তুলনায় এ দ্বীপে ডিউটি এবং ট্যাক্সের হারও আনুপাতিক ভাবে অনেক কম। আর এখানকার আইন কানুনও তেমন কড়া নয়।

এই সিসিলির পশ্চিমভাগ থেকে উত্তর আফ্রিকার টিউনিসিয়ার দূরত্ব হল ৯০ মাইলের মত সমুদ্র পথ।

এবং এই টিউনিসিয়ার কোন আইন কানুনের বা ট্যাক্স ডিউটির বিশেষ বালাই নেই।

ইতালীর সমস্ত উপকূল ভাগের দৈর্ঘ কিছু কম বেশী ২৫০০ মাইল এবং সিসিলির উপকূলের দৈর্ঘ ৫০০ মাইল। এত দীর্ঘ উপকূল ভাগের প্রতিটি মাইল নজরে রাখা বা পাহারা দেওয়া কোন দেশের কর্তৃপক্ষের পক্ষেই সম্ভব নয়।

অতএব প্রাচীন ইতালীয় আর্টরূপী স্মাগলিং-এর আদর্শ ঘাঁটি যে সিসিলি হবে তার আর আশ্চর্যের কি।

অবশ্য ইতালীর সেরা স্মাগলাররা কিন্তু সিসিলির অধিবাসী নয়। এমনকি তারা পুরুষও নয়, সবাই মেয়ে মানুষ।

ইতালীর মূল ভূখণ্ডের সর্বদক্ষিণের কুখ্যাত শহর বাগনারা ক্যালাব্রিয়া হল সেরাফিনার অভিযানের প্রথম হেড কোয়ার্টার।

লালসাময়ী, পাঁচফুট চার ইঞ্চি উচ্চতার রূপসী সেরাফিনা গিয়ে সেখানকার জলদস্যু স্মাগলার দলের সর্দারদের সঙ্গে দেখা করে সরাসরি লোভনীয় প্রস্তাব দিল:

—আপনাদের ঐ শ্লথগতি নৌকোর বদলে আমি দ্রুত গতি-সম্পন্ন মোটরবোট দেব। সিসিলি এবং উত্তর আফ্রিকার যত প্রকার নিষিদ্ধ দ্রব্যাদির পাইকারী ক্রয়ের ব্যবস্থা করব। কেনবার টাকারও ব্যবস্থা করব।

ইতালীতে যাতে সহজেই সেগুলো বিক্রী হয় সে বন্দোবস্তও করে দেব।

আমি পুলিশের হাত থেকে আপনাদের বাঁচাবার গ্যারান্টি দিচ্ছি। এ ব্যবসার লাভের অর্ধেক টাকা আপনারা পাবেন। আমি জানি ইতিপূর্বে বোধকরি এতটাকা আপনারা কখনো রোজগার করবার সুযোগও পান নি। অর্ধেক আপনারা বাকি অর্ধেক আমি নেব…।

মাস খানেক বাদে দেখা গেল ৪২ ফুট দীর্ঘ প্রচুর অশ্বশক্তি সম্পন্ন এক মোটর বোট কার্যস্থলে এসে গেছে।

কাজ শুরু হয়ে গেল।

ঘড়ির কাঁটায় কাজ চলতে লাগলো।

সেরাফিনা সস্তায় টিউনিসিয়াতে মাল কেনবার ব্যবস্থা করলো।

কালোবাজারী ইতালীয় বনিককুল মেয়েডাকাত বাহিত মাল এসে পৌঁছবার আগেই তা চড়াদামে কিনে নিতে লাগল।

১৯৫৩-র মধ্যে একটির জায়গায় ছয় ছয়টি মোটর বোটে চোবা চালানের কাজ চলতে লাগলো পুরোদমে।

দেশেব কাস্টম অফিসাবরা চরেব মারফৎ সবই জানতে পারে কিন্তু ধরতে পারে না।

জলদস্যু মেয়ে সেবাফিনার নাকি একটি এমন চর-গুপ্তচরের বিশাল দল আছে যা তুলনায় কর্তৃপক্ষের ইনটেলিজেন্ট বিভাগের চেয়ে কোন অংশেই নিকৃষ্ট নয়।

সেরাফিনা সুন্দর চেহারার বহু যুবতীকে নিযুক্ত করে দিকে দিকে তাদের পাঠাল।

কেউ গেল প্যালারমো, কেউ গেল সিরাকুসা, কেউবা এগ্রিজেণ্টো শহরে। আবার আরেকদল গেল টিউনিসিয়াতে।

মেয়েগুলি সেই সব স্থানে বিচিত্ররূপীনি হয়ে নানা খোঁজ খবর সংগ্রহ করতে লাগলো। নজর রাখতে লাগলো। কেনাকাটার চোরাকারবারীদের সঙ্গে চুক্তির ব্যবস্থা করল। এবং দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারী কর্মচাবীদের ছলে বলে কৌশলে অথবা দেহপণ্যে কাত করে ফেলে কার্য হাসিল করতে থাকল।

সেরাফিনার দল প্রধানত মেয়ের দল।

কিন্তু অচিরেই দলে দানব সদৃশ কিছু নিষ্ঠুর পুরুষের প্রয়োজন দেখা দিল।

কারণ হল, স্মাগলিং-এ যত রোজগার বাড়তে লাগলো ততই অপরাপর দলের মনে ঈর্ষাদ্বেষ দেখা দিতে থাকলো।

এবং একদা ট্রাপানিতে কার্যরত একটি কুখ্যাত দল সেরাফিনার দলীয় এক মোটর বোটের উপর চড়াও হয়ে মেয়েগুলিকে প্রচণ্ড প্রহার দিতে দিতে তীরে নামিয়ে দিল।

শুরু হল দীর্ঘকালস্থায়ী বিপরীতদলীয় ভয়ংকর লড়াই।

এই সব উপরোক্ত ধরনের ঘটনার বদলা নিতে নেতৃত্ব করল সেরাফিনা নিজেই।

এক নিশুতি রাতে ট্রাপানিস্থ দলটির হেডকোয়ার্টারে অতর্কিতে আক্রমন চালিয়ে বেরেট্টা পিস্তল এবং ব্রেডা সাবমেসিনগানের গুলিবৃষ্টি করে কয়েকমিনিটের মধ্যে তারা শত্রু পক্ষকে ধুলিস্যাৎ করে বিজয় গর্বে চলে গেল।

পালটা আক্রমন হল বোমা নিয়ে মেসিনার কিছু বেশ্যালয়ে। কিছু হতাহত হয়ে গেল। চলতে লাগলো লড়াই।

সরকারী কর্তৃপক্ষ কিন্তু তদন্ত করে খুব বেশী সুবিধে করতে পারল না।

দেখা গেল দুর্দান্ত মেয়ে সেরাফিনা আইন নিজের হাতে তুলে নিয়েছে।

নিজদলে আরও কিছু গলাকাটা স্বভাবের বদমাইস রগচটা পুরুষ নিয়েছে।

এইভাবে বেশ কয়েকবার এপক্ষে ও পক্ষে লড়াই হয়ে গেল। এমনি একটা লড়াইতে তো সেরাফিনার পনেরজন মেয়ে এবং পনের জন পুরুষ লোপাট হয়ে গেল।

ইতালীর নির্ভীক মতবাদের সংবাদপত্র "ইল গিয়রনেল" জ্বালাময়ী ভাষায় এই অরাজকতার তীব্র প্রতিবাদ জানাল।

এদের এই গ্যাংস্টারদের লড়াইয়ে বহু নিরীহ নাগরিকও বেঘোরে প্রাণ হারাতে লাগলো।

পত্র পত্রিকা মারফৎ দেশের জনমত এইসব ঘৃণ্য ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাল।

"ইল গিয়রনেল" তো স্পষ্টাস্পষ্টি সন্দেহ প্রকাশ করে লিখেই ফেলল :

এই নারীদস্যু নিশ্চয়ই বিশেষ কোন ব্যক্তি বা দলের কাছ থেকে গুপ্তভাবে ব্যাকিং পেয়ে যাচ্ছে। নয়ত এরা প্রকাশ্যে বেপরোয়াভাবে বিরুদ্ধদলকে আক্রমন করে নৃশংসভাবে মারধোর হত্যা ইত্যাদি করছেই বা কি করে। অথচ মজা এই যে যা-ও নগণ্য দু'একজন গ্রেপ্তার হচ্ছে তারাও কোন গুপ্ত মন্ত্র বলে শাস্তি পাচ্ছে না। বেকসুর খালাস পেয়ে যাচ্ছে সবাই…।

ক্রমে ক্রমে অপরাপর স্মাগলিং-এর দলপতিরা বাধ্য হয়ে দোর্দণ্ড প্রতাপ এই মেয়েদস্যু সেরাফিনার বশ্যতা স্বীকার করে নিল।

বিদ্রোহ করলে বা বিশ্বাসঘাতকতা করলে প্রাণ যায় অপঘাতে, তার চেয়ে বাবা অধীনতাই ভাল, বশ্যতাই বুদ্ধিমানের কাজ।

এর মধ্যে বেশী আত্মসম্মানজ্ঞানী দু'একজন যারা নারীর অধীনে কাজ করাকে অপমান ও অপৌরুষ বোধ করে দূরে সরে গেল, দেখা গেল তারা অচিরে এ পৃথিবী থেকেই সরে গেল সেরাফিনার বশংবদ গুণ্ডাদের হাতে।

ভয়ংকর বলে ভয়ংকর।

সেরাফিনার "রাণী"র আসন কেউ আর টলাতে পারল না।

১৯৫৫ থেকে ১৯৫৬ এই এক বছর হল ওর পক্ষে সব সেরা বছর।

সারা ইতালী দেশ অবৈধ ও নিষিদ্ধ বস্তুতে ছেয়ে গেল। ফলে সেরাফিনার আজগুবী অঙ্কের লাভের কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

ধরা যাক সিগারেটের কথা।

ইতালীতে টোবাকো ইণ্ডাষ্ট্রি রাষ্ট্র পরিচালিত একচেটিয়া ব্যবসা। তাই বুঝি দামও বেশী।

এক প্যাকেট সিগারেটের দাম ৩০ থেকে ৫০ সেন্ট। এ ব্যবসায় আয়ের দ্বারা রাষ্ট্রের প্রচুর লাভ হয়।

বাইরের আমদানী করা সমস্ত সিগারেটের উপর অতি উচ্চহার ডিউটি ট্যাকস চাপানো আছে।

অথচ স্মাগলাররা অতি অল্পায়াসে টিউনিসিয়ায় অতি সস্তা দরে হাজার হাজার টাকার বিদেশী সিগারেট কিনে সেগুলো ইতালীতে চোরাপথে এনে তিন চারগুন দামে বিক্রী করতে পারে।

এক একটি মোটর বোটে দশ হাজার কার্টন সিগারেট আসা সম্ভব। এক ট্রিপে লাভ হয় মোটামুটি প্রায় লাখ টাকা।

সেরাফিনার ফ্লিটে বহু মোটর বোট রয়েছে। তাতে করে বিচিত্র সব চোরাই মাল আসে দেশে।

আসে হীরে, ফার, ওষুধপত্র, হাতঘড়ি, ক্যামেরা, কাপড় চোপড় এবং ইতালীয় সরকার কর্তৃক উচ্চ করভাবে জর্জরিত হাজার রকমের বস্তু চোরাই চালানে দেশে ঢোকে।

এবং তা সবই ঐ সেরাফিনা পরিচালিত দলের অজস্র মোটর বোটের সাহায্যে ঢোকে।

এই স্মাগলিং-এর সেরা সামগ্রী হল নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্যসমূহ।

আফিম, মরফিন, কোকেন, হেরয়িণ প্রভৃতি জমকালো সব মাল উত্তর আফ্রিকার প্রতিটি স্থানেই অবাধে পাওয়া যায়।

চোরাপথে সেগুলি ইতালিতে এসে নেপল্‌স্‌-এ পৌঁছয়।

পরে গুপ্ত এক বনিকসম্প্রদায় কর্তৃক জাহাজযোগে ইয়োরোপের অপরাপর অংশে, ইংলণ্ড, ক্যানাডা এবং মার্কিন দেশে চালান হয়ে যায় যথাকালে।

সেরাফিনা ডোনেল্লি ১৯৫৯ পর্যন্ত একছত্র রাণীর মর্যাদায় স্মাগলিং চালিয়ে গেছে।

এক দিকে অপরাধী জগতে সে যেমন প্রতাপশালিনী তেমনি

অপরদিকে সে সরকারী পর্যায়ে পুলিশ বাহিনীর দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসারদের যথেষ্ট আনুকুল্য অবশ্যই পেয়ে এসেছে।

নয়ত ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৯ সুদীর্ঘ এক যুগ ধরে সে গ্রেপ্তার এড়িয়ে রইল কি করে, কেন তাকে গ্রেপ্তার করা হল না।

সেরাফিনা জীবনযাপনও করে প্রকৃত 'রাণী'র মত রাজকীয়-ভাবে। মেনিনা, প্যালারমো এবং আরও কয়েক স্থানে ওর বিরাট বিরাট জাঁকজমকপূর্ণ ঝলমলে 'ভিলা' বর্তমান। সে সব স্থানে সে বিরাট বিরাট অভিজাত ধরণের পার্টি দেয়। তাকে দেখা যায় রিভিয়েরায় কিংবা ইয়োরোপের বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর স্থানের অভিজাত জনগনের মধ্যে, মহামূল্য পোষাক ও জড়োয়া জুয়েলারী ঢাকা রূপবতী দেহ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে।

নিজের রূপ যৌবন ছলা কলা সম্বন্ধেও সে অত্যন্ত সচেতন।

একদা মণ্টিকার্লোতে সাক্ষাৎ পাওয়া জনৈকা ব্রিটিশ অভিনেত্রীকে নাকি সেরাফিনা সদম্ভে বলেছিল :

—হয়ত আপনাদের সিনেমা অভিনেত্রীদের মত আমি নিখুঁত সুন্দরী নই। তবে এটা জেনে রাখুন বিভিন্ন পুরুষদের আমার মত প্রকৃত আনন্দ দিতে, আপনাদের এক ডজন অভিনেত্রীও আমার সঙ্গে পারবে না। এটা চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি।

সেই ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে মাঝবয়সী কামপ্রবন কয়েকজন ব্যবসাদারের অভিযোগ ক্রমে পুলিশ ওকে গ্রেপ্তার করে বুঝি মারাত্মক ভুল করেছিল।

সেই গ্রেপ্তার না হলে একটা নগন্যা গনিকারূপে এত দিনে রোগে শোকে বিপদে আপদে স্বাস্থ্যহীনতায় হয়ত খতম হয়ে যেত এই মেয়ে।

কিন্তু গ্রেপ্তারের আক্রোশে এ মেয়ে হয়ে উঠল এক দানবী, দেশের পরম আপদ স্বরূপ।

তবে এক মাত্র ভরসার কথা, ক্রিমিনালদের আশা আকাঙ্খা

অপরাধেরও শেষ সেই···ফলে, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু—এই ফর্মুলায় কোন না কোন দিন বুলেট জর্জরিত মৃত্যুই ওদের নিয়তিতে লেখা থাকে।

সে দিনটির আশায়ই শান্তিকামী মানুষেরা বেঁচে থাকে, দিনও গোনে।

চার

বিরাট কালো রঙের জাহাজটাকে লেগুনের মধ্যে ঢুকতে দেখেই নেটিভ কানাকা উপজাতীয়দের মধ্যে উল্লাস ধ্বনি উত্থিত হল। স্থানটির নাম মানু নুকী। এখানে বড় একটা সাহেবের জাহাজ ভেড়ে না। নেটিভরা তামাক আর আর সুতী বস্ত্রের জন্য পাগল হয়ে আছে। যাক বাবা অবশেষে এই জাহাজ যেন আশীর্বাদ স্বরূপ এগিয়ে আসছে।

কাছাকাছি আসতে জাহাজের অদ্ভুত স্কিপারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল ডেক-এর রেলিং ধরে। ওদের পানে তাকিয়ে সেই বিশালকায় মানুষটা হাসছিল। স্যামোয়া রাজাদের চেয়েও দীর্ঘকায়। বিরাট গলা মাস্তুলের মত উঠে এসেছে ষাঁড়ের মত বুক থেকে। মাথাটা বিরাট, বড় চোয়াল সমন্বিত মুখ। সুন্দর কিন্তু বড় নিষ্ঠুর সুন্দর। ঘন কৃষ্ণ দাড়ি গোঁফ। হাসিতে তার নেকড়ের মত কতকগুলি দাঁত বেরিয়ে পড়েছে।

অকস্মাৎ একটা দমকা বাতাস বয়ে গেল সমুদ্র দিয়ে, পালগুলো উথাল পাথাল হল। আর সেই সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ স্কিপারের লম্বা চুল কাঁধ থেকে উড়ে উঁচু হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ নেটিভদের নজরে পড়লো শ্বেতাঙ্গের একটি কান নেই।

—পালা, পালারে শীগ্‌গির পালা, নেটিভদের জনৈক সর্দার চীৎকার করে বলে উঠলো, এ হল বুলি হেস রে।

দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করতে হল না। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসা ক্যানো নৌকোগুলো পেছন ফিরে প্রচণ্ড জোরে বৈঠা চালিয়ে তীরের

দিকে পালিয়ে যেতে লাগলো। এই লুঠেরা, বোম্বেটে জলদস্যু, গুণ্ডা ও খুনে বুলি হেসকে কে না চেনে।

'লিওনারা' নামক জাহাজের ডেকে দাঁড়ানো বুলির মুখ ক্রোধে লাল হয়ে উঠলো, এঃ শালারা পালিয়ে গেল। ভেবেছিলাম ক'টা কানাকাকে ধরে জাহাজে ক্রু বানিয়ে নিয়ে যাব। নাঃ আমি বড় বেশী পরিচিত হয়ে পড়েছি।

—ক্যাপটেন্, ডাঙ্গায় নামবেন না কি ওদের জন্য? পাশে দাঁড়ানো ফার্ষ্ট মেট জিজ্ঞেস করে।

—তাতো যেতেই হবে হে। আরে এটা তো চুনোপুটি অঞ্চল। সারারাত্রি পড়ে রয়েছে মজা আর ফুর্তি করবার।

ফার্ষ্ট মেট হাসলো। কর্তার মতি গতি সে ভাল ভাবেই জানে। বুলি হেস-এর জীবনে নারী, অর্থ-র পরেই পছন্দের বস্তু হল মারপিট লড়াই করা।

আজ রাত্রে এই কানাকা অধ্যুষিত গ্রাম আক্রমণ করে উপরোক্ত তিন বস্তুর রসাস্বাদনই হবে তার।

জন্মের পর থেকেই লড়াই চালাতে হচ্ছে বুলিকে। ওর জন্মভূমি ওহিও রাজ্যের ক্লিভল্যাণ্ড, জন্মের সময়টা ১৮২৯ খৃষ্টাব্দ। মারকুটে বদমাইস জাতীয় এই ছেলে কৈশোরেই দেশের এক পাদ্রীর কন্যাকে বিপদে ফেলেছিল। মেয়েটির ভাই ও কাকা শাসন করতে এসে এমন প্রহার খেল যে ভাইটির জীবন সংশয় হল। খুনের ভয়ে হেস দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেল।

যাবার সময় বাপের প্রচুর অর্থ, দুটি দাম না পরিশোধ করা ঘোড়া আর একটি যুবতীকে সঙ্গে নিয়ে গেল।

কিছুদিনের জন্য গ্রেট লেক-এ সে নাবিকের কাজ করল। এখানেই সে কানটি হারায় এবং এমন একটি নামে অভিহিত হয় যা চলে তার সারা জীবন ধরে।

তাস খেলার ব্যাপারে চুরি করেছে একজন নাবিক ওকে এই

অপবাদ দেওয়ায় বুলি ছুরি বের করে পড় পড় করে তার শার্টটাকে কেটে ফেলে দেয়। নাবিকও রেগে মেগে ওর মুখে মারে প্রচণ্ড ঘুসি এবং ছুরি দিয়ে ওর একটি কান কেটে নেয়। অবশ্য পর মুহূর্তে নাবিককে ওর হাতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়।

একঘর লোকের সামনে হত্যাকাণ্ড সমাধা করে, কানকাটা অবস্থায় ছুরিহাতে প্রত্যেককে শাসাতে শাসাতে এই দানব বেরিয়ে যায়। কিন্তু পুলিশের ভয়ে স্থান ত্যাগ করে যায়। এবং ক্লিভল্যাণ্ড থেকে আনা যুবতীটিকেও সে ত্যাগ করে চলে যায়। যুবতীটি তখন গর্ভবতী অতএব তাকে আর তার প্রয়োজন নেই।

এবার যুক্তরাষ্ট্রই ছাড়লো। ক্যান্টন নামে এক জাহাজে উঠে সিঙ্গাপুর চলে গেল। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে কি যে প্রকৃত হল কেউ তা জানে না। তবে দেখা গেল ক্যান্টন জাহাজের ক্যাপ্টেন ও নাবিক-দল রহস্যজনকভাবে বেপাত্তা হয়ে গেছে। সিঙ্গাপুরে যখন জাহাজ নোঙর করলো তখন দেখা গেল সেখানে শক্ত চোয়ালের গুণ্ডা ধরনের ২৪ বছর বয়সের বুলি হেস ক্যাপ্টেন হয়ে বসেছে। যারা যাত্রী ছিল এমন লোকেরাই ক্রুরূপে কাজ করছে সেখানে। কিভাবে যে এই দুর্দান্ত তরুণ এতবড় ব্যাপারটা ম্যানেজ করলো তা আজও অপ্রকাশ্যই রয়ে গেছে।

ক্যান্টন জাহাজ ও তার খোলভর্তি পণ্য সামগ্রী দুই বিক্রী করে দিয়ে, আর একটি নতুন জাহাজে উঠে ও হুবহু একই কাণ্ড করে তার দখল নিল, সে জাহাজের নাম হল ওট্রান্টো। এরপর ওট্রান্টোকে বিক্রী করে বেইমান চীনা মালিকের কাছ থেকে ফের ক্যান্টন জাহাজ কিনে নাম পালটে রাখলো ব্রাডলি জুনিয়ার।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল বুলি হেস—দু'হাজার ডলারে মর্টগেজ রাখলো জাহাজ। কেননা তাকে সাংহাই যেতে হবে। খালি জাহাজ তো নিয়ে যাওয়া যায়না, তাই খোল ভর্তি করে নিল মূল্যবান সব পণ্যসামগ্রীতে সিঙ্গাপুর থেকে, অবশ্য সমস্তটাই ধারে।

সিঙ্গাপুরের বনিকরা নিজেরাও চোর' জোচ্চোর। তাই তারা ফেলো কড়ি মাখো তেল হিসেবে জানালে দাম না দিয়ে জাহাজ ছাড়তে পারবে না।

কিন্তু বাবার ও বাবা আছে। বুলিহেস তাতেই রাজি হল হাস্য-বদনে। কাল ব্যাঙ্ক খুললে টাকা অবশ্যই দেব। এবং গভীর রাতে, কাউকে গুডবাই না জানিয়ে, কাষ্টমস্ ক্লিয়ারেন্স না নিয়ে ব্রাডলি জুনিয়র নিয়ে হাওয়া হয়ে গেল গভীর সমুদ্রে।

ঘা খাওয়া বনিক সম্প্রদায় ওর পিছু এক জাহাজ পাঠালো ওকে ধরতে কিন্তু বুলি হেস আরও চতুর। সে আর সাংহাই মুখো গেলই না। পরিবর্তে কয়েকমাস বাদে এসে উপস্থিত হল জাভার উপকূলে ব্যাটাভিয়াতে। সেখানে ধার করে আসা মাল অতি উচ্চমূল্যে ঝেড়ে দিয়ে এবং সেখান থেকে মহামূল্য মশলায় পূর্ণ করল জাহাজ।

একবার ধরতে আসা একজন কাষ্টম অফিসারকে সে কলার ধরে সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করেছিল। রেগেমেগে বাটাভিয়ার গভর্ণর স্বয়ং ওর জাহাজে এসে কৈফিয়ৎ তলব করতে রক্তচক্ষু বুলিহেস রেগে বলেছিল, বেশ করেছি, কেন সে আমায় মিথ্যুক বলেছিল।

সাঁতার না জানায় গভর্ণর আর উচ্চবাচ্য না করে জাহাজ থেকে চলে গিয়েছিল। এবং ব্যবসা বাণিজ্যে আর কোন বাধা দেয় নি।

ওলন্দাজ বণিকরা আরও বেশি হুঁশিয়ার। তারা আগে টাকা দিলে তবে মাল জাহাজে তুলতে দেবে। বেশ তো তাই হবে, হেসে রাজি হল বুলি হেস। তারপর সিঙ্গাপুরের এক ব্যাঙ্কের উপর চেক কেটে তাদের হাতে দিয়ে প্রচুর মশলা, কুইনাইন, বাটেক প্রভৃতিতে জাহাজ ছেড়ে দিল। সে চেক রবার বলের মত ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল ব্যাঙ্ক থেকে। কিন্তু যখন জাল ধরা পড়লো তখন বুলি বহুদূর সমুদ্রে—অষ্ট্রেলিয়ার পথে পাড়ি মারছে। সেখানে পৌছে আজগুবী দামে সব মাল বিক্রি করে দিল সে।

ফ্রি ম্যাণ্টলে পৌঁছে সহসা সুমতি হল তার। নাঃ আর কুপথে অর্থোপার্জন নয়। এবার সৎ ও সাধুর জীবন।

জাহাজের ব্যবসা শুরু করলো। দুই বন্দরে দুটি বিয়ে করলো। তাতেও মানালো না। তখন ফ্রি ম্যাণ্টলির এক রূপসী বিধবাকে তৃতীয় পত্নী হিসেবে গ্রহণ করলো। এই তৃতীয়া সবিশেষ ধনী রমণী ছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই স্থানীয় সংবাদপত্রগুলি ওর বিগত জীবন উদ্‌ঘাটিত করে দিল।

বুলি তো রেগে আগুন। কাগজওয়ালারা লিষ্টের পর লিষ্টে সিঙ্গাপুর থেকে সানফ্রানসিস্কো পর্যন্ত কত চুরি, কত ধার, কত ছিনতাই, কতগুলো গ্রেপ্তারী পরোয়ানা সব প্রকাশ করতে থাকলো।

ইতিমধ্যে এক বন্ধুর দ্বারা গুজব রটিয়ে দিল যে, সে একটা ইংলণ্ডগামী জাহাজে করে পালাচ্ছে। পুলিশ ও পাওনাদারেরা যখন সেই জাহাজে ওর খোঁজে ব্যস্ত তখন সে অপর এক জাহাজে চেপে মেলবোর্ণ-এর পথে চলে গেল। যথারীতি ধনী তৃতীয়া পত্নীকেও ত্যাগ করে গেল।

কিন্তু কমলি তো ছাড়লোনা তাকে। তৃতীয়া পত্নী বড় স্নেহ-ভালবাসাপ্রবণ মেয়েছেলে। সে খুঁজে খুঁজে ঠিক বুলির কাছে গিয়ে মেলবোর্ণে উপস্থিত হল। বুলি খুশীই হল কেননা এই তৃতীয়া যাবতীয় ধন সম্পদ সঙ্গে নিয়েই সেখানে গিয়েছিল।

চোরেরাই বুঝি বেশী বিশ্বাসযোগ্য হয়। না হলে কি করে ওরেষ্টেস নামক একটি জাহাজের মালিককে বুলি রাজি করায় তাকে উক্ত জাহাজে স্কিপার করা হোক। জাহাজ যাবে ভ্যাঙ্কুবার। কি করে মালিক রাজী হল সে এক রহস্য।

বুলির কোন পরিচয় জ্ঞাপক কাগজ নাই। বুলির চেহারার বর্ণনা অষ্ট্রেলিয়ার যাবতীয় সংবাদপত্রে বেরিয়েছে। সবার ওপরে এক কানকাটা মানুষ এতদ্দেশে খুব কমই আছে অথচ জাহাজের মালিক বিনা দ্বিধায় এতটুকু সন্দেহ না করে ওর হাতে ওরেষ্টেস তুলে দিল।

হনলুলুতে বিস্তর জাল চেক দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করে কয়েক সপ্তাহে মধ্যে প্রচুর রোজগার করে নিল সে। তারপর চেক ডিসঅনার্ড হবার পূর্ব্বেই এক লাক্সারী লাইনারে চেপে মার্কিন দেশে পাড়ি জমালো।

দেশে সুবিধে হল না। খুনাদির ব্যাপারে তার নামে বহু ওয়ারেন্ট ঝুলছে। অতএব জাল চেক দিয়ে সে এলিনিটা নামে একটি জাহাজ ক্রয় করে। কাষ্টমকে ফাঁকি দিয়ে একদিন মার্কিন উপকূল থেকে হাওয়া হয়ে গেল। সানফ্রানসিসকো বন্দরে ক্রন্দনরতা গর্ভবতী একটি স্ত্রীকে ফেলে রেখে গেল। জাহাজের খোলে চল্লিশ টন বীন্‌স্।

হাওয়াইএ পৌঁছে কাষ্টমের পরোয়া না করে বে-আইনি ভাবে বিক্রী করে দিল সব বীন্‌স। স্থানীয় শেরীফ টের পেয়ে জাহাজে এসে ওকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। বুলি সুবোধ বালকের মত অনুতপ্ত ভাব দেখালো বে-আইনী কাজ করবার জন্য। ঠিক আছে সব টাকা মিটিয়ে দিচ্ছি। আপনি স্যার আসুন কেবিনে, ভাল মদ আছে একটু গলা ভিজিয়ে নিন। মদ বেশ কড়া। শেরীফ খেয়ে টাল মাটাল হল। পরে বললে, চলুন আমার অফিসে।

ডেকএ বেরিয়ে তো শেরীফের চক্ষু স্থির। জাহাজ তীরভুমি থেকে বহুদূর সমুদ্রে চলে এসেছে।

—কী ব্যাপার তীরভূমি যে দেখাই যাচ্ছে না?

—তাই তো। এখন কি উপায়?

—আমি কি করে তীরে নামব?

বুলি ছোট্ট নৌকো দেখিয়ে জানায় ওতে করে। উত্তাল সমুদ্র। ঐ নৌকো কতক্ষণ টিকবে।

—ঐ ফুটো নৌকোয় যাব কি করে?

—তাহলে চলুন আমাদের সঙ্গে তাহিতি। অবশ্য এটা যাত্রী জাহাজ নয়। সারাটা পথ আপনাকে খালাসীর কাজ করে যেতে হবে।

শেষটায় ছোট্ট নৌকোয়ই উঠে বসলো। মরতে হয় স্বদেশের সমুদ্রে মরাই শ্রেয় এই ভেবে। এই ভাবে বুলির একজন শত্রু বাড়লো। বুলি তাতে পরোয়া করে না। সে বলে, ভাল বন্ধুর পরেই আমি ভাল শত্রু চাই।

মাসখানেক বাদে সেই [illegible] ভেঙে তুফানে পড়ে ডুবুডুবু হয়। বুলি আর একবার [illegible] ক্রু একটা [illegible] প্যাগো প্যাগো চলে যায়। পেছনে ফেলে যায় ওর বাকি নাবিকদের, যারা সেই হাঙর অধ্যুষিত ভয়ঙ্কর সমুদ্রে [illegible] গিয়েই প্রাণ হারাবে।

বুলি আর [illegible] সঙ্গ [illegible] সিডনী পৌঁছে ক'দিন চূড়ান্ত বেলেল্লাপনা করে আমোদ স্ফূর্তিতে! মদ আর মেয়ে মানুষ। পুলিশ এসে বুলি হেস-কে গ্রেপ্তার করে নানা অভিযোগে অভিযুক্ত করে।

বুলির ক'জন শ্যালক, যারা জানে না যে সে তার স্ত্রীকে ত্যাগ করেছে, ওকে জামিনে খালাস করে আনে। বুলিও এই উপকারের উত্তর দেয়। কার্ণিভ্যালের সঙ্গে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়ে। এখানে সে তথা কথিত "বিয়ে" করে "মিসেস বাকিংহাম" নাম্নি এক লেডিকে। এই লেডি অস্ট্রেলিয়ার স্বর্ণখনি সমূহের স্ত্রীলোক বর্জিত মানুষদের ভাগ্য গননা করত এবং আরও নানাভাবে তাদের আনন্দ দান করত।

এই কার্ণিভ্যালে থাকাকালীন জুয়ার আড্ডা খুলে এক খুনের দায়ে পড়লো বুলি। পালাবার পূর্বে সে তার পত্নী মিসেস বাকিংহামকেও সঙ্গে নিয়ে যায়।

মিসেস বাকিংহাম কিন্তু ওর সম্বন্ধে বড় চমৎকার কথা বলেছিল। বুলি হেস হল সেই ধরণের মানুষ যে নিজের মা বাবাকে খুন করার পর গিয়ে আদালতের করুণা ভিক্ষে করে এই বলে যে আমি একজন অনাথ।

এরপর অপর একজন জাহাজ মালিকের "ব্ল্যাক ডায়মণ্ড" নামক জাহাজের স্কিপার হয়ে বসে।

কয়লা বোঝাই করে ব্রিসবেনের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সঙ্গে ছিল 'পত্নী' মিসেস বাকিংহাম আর তার পাঁচটী কন্যা। কয়লা অবশ্য নিয়ে যাবার কথা ব্রিসবেন, কিন্তু হেস তাকে নিয়ে গেল নিউজিল্যাণ্ডের অন্তর্গত অকল্যাণ্ড বন্দরে। এখানে কয়লার দাম চড়া। সমস্ত অর্থটাই তার পকেটে চলে গেল।

নতুন মাল নিয়ে "ব্ল্যাক ডায়মণ্ড" বন্দর থেকে সরে পড়ল এবং ...বেপাত্তা হয়ে গেল। অবশেষে যখন হেস নিউজিল্যাণ্ডের অপর একটি বন্দরে গিয়ে উপস্থিত হল সে জানালো এক আজগুবি গল্প: কিভাবে তার জাহাজ মালপত্র ও লোক লস্কর নিয়ে ঝড়ে ভেঙ্গে গিয়ে ডুবে গেল তার অবিশ্বাস্য কাহিনী। সে ছাড়া আর কেউ নাকি বেঁচে নেই। স্থানীয় লোকেরা কিন্তু কাহিনীটা পুরোপুরি বিশ্বাস করল না।

সেখান থেকে চুরি করা ছোট্ট এক মাস্তুলওয়ালা জাহাজ, নাম 'ওয়েভ' নিয়ে কেটে পড়লো। একে জাহাজ না বলে বড় নৌকো বলাই শ্রেয়। বুলি হেসকে একাই যেতে হবে সেটা নিয়ে। বিরক্তি-কর একক যাত্রা। তারও এক ফয়সালা করে ফেলল সে।

ডেইজি নামে ষোড়শী এক মেয়ে, যার উচ্চাকাঙ্খা ছিল অভিনেত্রী হবার তাকে চীনা উপকূলের কোন এক বন্দরে অবশ্যই থিয়েটারের চাকরী জুটিয়ে দেবে এই প্রলোভন দেখিয়ে নৌকায় তুললো। সে অবশ্য খুলে বলল না যে সেই 'থিয়েটার' হল আসলে একটি চীনা গণিকালয়।

যথাকালে নির্দিষ্ট স্থানে ওয়েভ নামক ছোট্ট জাহাজ ও ষোড়শী মেয়ে ডেইজীকে যুগপৎ বিক্রী করে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে সে ফিরে এল ওয়েলিংটনে এবং সে সময়ই নিউজিল্যাণ্ডে মাউরীদের রক্তাক্ত অভ্যুত্থান ঘটে।

হেস "দি বুল পাপ" নাম্নি একজন স্বনামধন্য গনিকাকে পটিয়ে তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে শ্যামরক নামক একটি জাহাজ কিনে ফেললো।

নরমাংসভুক মাউরীদের কাছে বন্দুক বিক্রী একটা অতীব লাভের ব্যবসা। কয়েকটি জং ধরা বন্দুকের বিনিময়ে প্রচুর লেবু, কমলা, বাতাবি, নারকেল, শুয়োর এবং কিছু মেয়ে ভর্তি করে শ্যামরক জাহাজ নিয়ে ফিরে এল। দ্বীপে এ কথা প্রায় প্রবাদ বাক্যের মত রটে গেল যে বুলি হেস শত শত জংলী কুমারীদের সঙ্গে নিয়ে এসেছে কিন্তু একটিকেও বিক্রী করেনি। পরে সংবাদ আসতে থাকে বহু নেটিভ মেয়েদের বলাৎকার করে নির্জন দ্বীপে কে বা কারা যেন ছেড়ে দিয়ে এসেছে। হেস নিজেকে একজন মিশনারী বলে প্রচার করতে লাগলো।

একজন সাংবাদিককে সে সরাসরি বললে অতীতের দিনগুলির জন্য সে অনুতপ্ত। এখন সে স্থানীয় হিদেনদের আত্মার সদগতির জন্য জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে। তার জাহাজ যেন ভাসমান গীর্জায় পরিবর্তিত হল। নেটিভরা দলে দলে এসে জাহাজে উপাসনা করতে আরম্ভ করল। দেখা গেল উপাসনার সময় ডেকের ডালা বন্ধ হয়ে তালা বন্ধ হল আর জাহাজ নোঙর তুলে সমুদ্রে পাড়ি জমালো। অতঃপর হপ্তা কয়েক বাদে এক জাহাজ 'কানাকা' উপজাতিকে নিউ কালেডোনিয়া বা গুয়াডাল এ কোপরা বা অন্যান্য বাগিচায় কর্মী হিসেবে বিক্রী করে দেওয়া হল। বুলির পকেট ভর্তি হতে লাগলো মানুষ বেচা টাকায়।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর বুলি জাহাজে প্রায় ১৫০ জন কানাকা ক্রীতদাসকে বিক্রীর উদ্দেশ্যে নিয়ে চললো। বুলি হেস সে লাইনে গেল না। সে সরাসরি নেটিভদের বন্দুক পিস্তলের নল ঠেকিয়ে জাহাজে তুলতে লাগলো বিক্রীর উদ্দেশ্যে।

কিছু শ্বেতাঙ্গ আর কিছু নরমুণ্ড শিকারী মেলানেশিয়ান

ক্রুর সাহায্যে সে এক সময় প্রায় পুরো উপজাতিকে বন্দী করে ফেলেছিল।

কালো জাহাজে, কালো ব্যবসারত স্কিপার রাজার মত জীবন-যাপন করত। তার জাহাজের 'ক্রু'দের যত খুশী রাম (মদ) পান করা বা সুযোগ মত পাওয়া স্ত্রীলোক ভোগ করার অধিকার ছিল। তবে বুলি দুটি আইন কঠোর ভাবে জারী করেছিল তার জাহাজে।

যদি কেউ বেহেড মাতাল হয়ে ওয়াচ-ডিউটিতে সমর্থ না হয় তো তাকে তক্ষুনি সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে। দ্বিতীয় নিয়ম হল, নারী সংক্রান্ত ব্যাপারে কেউ কখনো মারপিট লড়াই করতে পারবে না। জাহাজে খোল ভর্তি নেটিভ মেয়ে রয়েছে সে ক্ষেত্রে মারামারি কামড়া-কামড়ি অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে বিবেচিত হত। মেয়ে নিয়ে ঝগড়ায় প্রথম অপরাধে চাবুক মারত সে। দ্বিতীয়বার হলে তাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হত। সুতরাং জাহাজে ঝগড়াঝাটি হত না বললেই চলে।

"লিওনারা" জাহাজ ছিল একটি ভাসমান হারেম বিশেষ। সেরা মেয়ে বুলির ভাগেই নির্দিষ্ট ছিল। মাত্র পনেরটী মেয়ে এক এক ক্ষেপে হলেই তার চলে যেত। সে তার প্রিয় মেয়েদের বিক্রী করত না। হাতে একটী কাগজ ধরিয়ে বন্দরে নামিয়ে বলত কোন বার-এ যেতে। সেখানকার শ্বেতাঙ্গরা অবশ্যই তাদের দেখাশুনা করবে।

এরপর যখন সে একবার জাহাজ ডুবি হয়ে একটী দ্বীপে রাজা বলে মদ ও মেয়েমানুষে চুর, সে সময় ব্রিটিশ নেভি 'রোজারিও' গিয়ে উপস্থিত সেখানে। তারা বুলি হেস-কে শেকলে বেঁধে জাহাজে ওঠালো।

বুলি হেস-এর গ্রেপ্তারের সংবাদ বিশ্বে এক চরম চাঞ্চল্য তুললো। ব্রিটিশ, আমেরিকান, অষ্ট্রেলিয়ান, নিউজিল্যাণ্ডার, ওলন্দাজ, হাওয়াইয়ান, ফরাসী সবাই একমত হয়ে বললে ওর ফাঁসী হওয়া উচিত। এখন একমাত্র তর্কের বিষয় হল যে কোন দেশ তাকে ফাঁসী লটকাবে।

এই জটিল মুস্কিলের অবসান বুলি হেস নিজেই করে দিল, ছোট্ট একটি নৌকো করে পালিয়ে গিয়ে। সমুদ্রমধ্যে কম্পাস, চার্ট, খাদ্য ও পানীয় জল ছাড়াই সে ভেসে চললো। হাজার মাইলের মধ্যে কোন তীরভূমি নেই। মনে হল এই বুঝি বুলি হেস-এর অন্তিম অবস্থা।

নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে মাঝ সমুদ্রে ওকে বাঁচায় মার্কিন একটী তিমিধরা জাহাজ এবং ওকে গুয়াম-এ নামিয়ে দিয়ে যায়।

সেখানকার কর্তৃত্ব স্পেনের হাতে। ওর বিরুদ্ধে তাদের কিছু অভিযোগ ছিল না। সেটা পূর্ণ করে দিল ও নিজেই। একটি স্প্যানিশ জাহাজ চুরি করে তাতে কতকগুলি কয়েদীকে নিয়ে পালাবার মুখে ধরা পড়ে গেল।

স্পেনীয় গভর্ণর একবর্ণ ইংরেজি বোঝে না। সে ওকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে অপরাপর কয়েদীদের সঙ্গে ম্যানিলাতে পাঠিয়ে দিল। সেখানে বিচারে ওর এক বছর জেল হয়।

জেল থেকে বেরিয়ে একটি জাহাজ চুরি করে নিয়ে জাপানে চলে যায় ফিলিপিন্স থেকে। এর বছর খানেক বাদে তাকে দেখা গেল সানফ্রানসিসকোতে।

এখানে পরিচয় হল এক পয়সাওয়ালা দম্পতির সঙ্গে। লোকটির নাম মুডি, বউএর নাম জেনি। বুলি হেস লোকটাকে প্রচুর লাভের ব্যবসার প্রলোভন দেখালে। তাহিতিতে নাকি পয়সার ছড়াছড়ি। সেখানে নেটিভ গার্লরাও যেমন সরেস, তেমনি ওখানকার মুক্তো এক একটা ওয়ালনাটের সাইজ। টোপ গিলে নিল মুডি।

মুডির পয়সায় 'লোটাস' নামে একটি ছোট্ট জাহাজ কিনে ফেলল বুলি। ব্যবসার পার্টনার সে। পরে নাকি অর্ধেক টাকা সে দিয়ে দেবে। একটা কাজের অজুহাতে মুডিকে অন্যত্র পাঠিয়ে, বুলি লোটাস ও জাহাজ ভর্তি ধার করা মাল এবং মুডির পত্নী জেনিকে নিয়ে সমুদ্রে ভেসে পড়লো।

জাহাজের পাল তোলা পাল খাটানোর জন্যে দুজন আজব চরিত্রের নাবিক নিযুক্ত করেছিল বুলি বারবারি কোস্ট থেকে। এদের এক জনের নাম চার্লি এলসন, অপরের নাম ডাচ পিটে। এলসন 'রাম' পেলেই খুশী। জাহাজের একমাত্র মেয়েছেলের প্রতি তার কোন নজর ছিল না। কিন্তু ডাচ পিটে তা নয়, সে তাজা তরুণ এবং স্বাস্থ্যবান যুবক।

এর উপর ডাচ পিটে চাকরী নিয়েছিল কুক হিসেবে। কুক হিসাবে কিন্তু বুলি তাকে ঘন্টার পর ঘন্টা ডেক-এ দাঁড়িয়ে ওয়াচ ডিউটি করাতে বাধ্য করেছিল। ডিউটির ক্লান্তিকর সময়ে তার কানে আসতো নিচের কেবিন থেকে নারী কন্ঠের আর্তনাদ আকুতি মিনতি। জেনিই একমাত্র যুবতী যে প্রাণপণ বাধা দিয়ে যাচ্ছিল এই ঘৃণার্হ নারীখাদক দানবকে। অবশ্য এ বাধায় সে কিছু বিপদ ঠেকাতে পারে নি। প্রচুর প্রহারও খেয়েছে আর জাতও গেছে।

বুলি খাবার অন্ন বুদ্ধি ডাচ পিটেকে নিয়ে পড়তো। তাকে সর্বক্ষণ গালাগাল মন্দ করত সামান্য অপরাধের জন্য। দুজনেই অত্যাচারিত। অতএব দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রাকালীন ডাচ পিটে ও জেনির মধ্যে সমমর্মিতার সম্পর্ক নিঃশব্দে গড়ে ওঠে। দুজনেই আকণ্ঠ ঘৃণা করে দানবটাকে। কেউ কারুর সঙ্গে সাক্ষাৎ, আলাপ বা কথাবার্তার সুযোগ ছিল না।

একরাত্রে এলসনের ঘুম ভেঙে গেল উপরের ডেক থেকে আসা চীৎকার ও ধপা ধপ শব্দে।

দৌড়ে উপরে এসে এক আজব দৃশ্য দেখে তার চক্ষু ছানা বড়া হয়ে গেল। ডাচ পিটে হুইল ধরে দাঁড়িয়ে তার ডান হাতে রক্তাক্ত একটি মাংস কাটা কুঠার, বাম হাতে জড়িয়ে ধরে আছে বিবস্ত্রা জেনিকে, মেয়েটার সর্বাঙ্গে আঁচড় ও কালসিটে দাগে ভর্তি, বুলি হেস-এর প্রহারের ফলে আহত হয়েছে মেয়েটি।

মুখে বীভৎস হাসি নিয়ে ডাচ পিটে সহকর্মী এলসনের পানে তাকালো।

—এলসন তুমি হুইলটা ধরো, সুইডেনবাসী ডাচ পিটে বললে, আমি আর মিসেস জেনি নীচে যাচ্ছি, বলে জেনির কাঁধে মুখ ঠেকালো। আর জেনিও সহাস্যে সম্মতি জানালো।

—হেস কোথায়? এলসন রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করে।

—তুমি শুধু হুইলটা ধরো। আজে বাজে প্রশ্ন করতে হবে না তোমায়।

—আমি বলছি শুয়োরের বাচ্চা এখন কোথায়। যুবতী জেনি সহাস্যে বলে উঠে, এখন বোধহয় কোন হাঙরের পেটে চলে গেছে সে।

এলসন জাহাজের পেছনে ফেনা ওঠা ঢেউ এর দিকে বারেক তাকালো। আশে পাশে হাঙরদের লেজ দেখা যাচ্ছে।

এই ভাবে দুর্দান্ত জলদস্যু কুখ্যাত বুলি হেস এর অপঘাতে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়ে গেল। সাউথ সীজ-এ এ সংবাদ যেন আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো সবাই।

পাঁচ

যে কাহিনীটি বলতে যাচ্ছি সেটি একদিক থেকে বড়ই বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ এক ঘটনা। কোথায় জলদস্যুতার নিচবৃত্তি আর কোথায় মাননীয় বিচারপতির জীবন। অথচ আশ্চর্য এই দুই জীবনই যাপন করেছিল একই ব্যক্তি। এত নিচু থেকে এত উঁচুতে উত্তরণ, মানব ইতিহাসে দ্বিতীয় নজির বিরল। এবার গল্প শুরু :

সোনা! উঃ কত সোনা! হায় ঈশ্বর! লোকটা এক কাঁড়ি সোনার মোহর গুনছে রে!—হোটেলের ৩০৩ নম্বর ঘরের দরজার ক্ষুদ্র এক ছিদ্রপথে চোখ রেখে এ দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গিয়ে স্বগতোক্তি করে উঠল এরিক কবহ্যাম।

ঘরটি হল অক্সফোর্ডের ব্র্যাডফোর্ড হাউস নামক একটি হোটেলের। হাঁটু গেড়ে বসে বসে কবহ্যাম ফুটোয় চোখ রেখে দেখছিল কেমন করে ঐ ঘরের বাসিন্দা বুড়ো উইলিয়াম হেস একে একে মোহরগুলো গুনে চলেছে। উল্লাস ও উত্তেজনায় এরিকের সারা গায়ে রোমাঞ্চ দেখা দিল।

মিস্টার হেস অবশ্য জানতেই পারল না যে কে একজন দরজার ফুটো দিয়ে তার এই অদ্ভুত গণনকার্য লক্ষ্য করে যাচ্ছে অলক্ষ্যে।

প্রায় মধ্যরাত। বেশ কনকনে ঠাণ্ডা থাকা সত্ত্বেও বৃদ্ধ হেস কেবলমাত্র একটা দীর্ঘ নাইট-শার্ট পরে বসেছিল, বোধকরি টাকার গরমেই তার শীত করছিল না। মাথায় অবশ্য একটা নাইটক্যাপ ছিল।

বেশ পয়সাওয়ালা ধনী ব্যক্তি এই বৃদ্ধ হেস, অক্সফোর্ডে এসেছিল সম্পত্তিবাড়ি প্রভৃতি কেনবার উদ্দেশ্যে। এই মাঝরাতে লোকটি কি জানি কেন, মিটমিটে মোমবাতির কম্পিত আলোকে বসে বিছানার উপর ছড়ানো ৪০০ পাউণ্ড স্বর্ণমুদ্রা এক মনে গুণে যাচ্ছিল।

আর যারই থাক এরিক কবহ্যামের অস্থির চিত্ততা বলে কোন বদনাম ছিল না। সঙ্গে সঙ্গেই সে মনস্থির করে ফেললো।

বিচিত্র তার জীবন। অল্পকালের জন্য চোরাকারবারির জীবন, পরে ছিনতাই কর্মে কিছুকাল, অতঃপর সে কপাল ফেরানো রুজি রোজগারের চেষ্টায় অক্সফোর্ড এসে উঠেছিল।

এসেই ছোট্ট একটা পরিচারকের কাজ নিল ব্র্যাডফোর্ড হাউস নামক হোটেলে। কেন না ছোটখাটো চুরি চামারির ভাল ভাল সুযোগ রয়েছে এখানে।

সেই পরিকল্পনা অনুসারে বেড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে গভীর রাত্রে ডাইনে বাঁয়ে ঘুমন্ত বোর্ডারদের ঘরের মাঝখান দিয়ে যাওয়া লম্বা করিডোর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল।

সহসা ৩০৩ নম্বর ঘরের ভেতর থেকে আসা আলোকরশ্মি দরজার

ফুটো দিয়ে দেখামাত্র চোখ রাখলো সেখানে। তারপরই দেখে শুনে হাঁ হয়ে গেল। এতগুলো স্বর্ণ মুদ্রা গুণছে ঐ বুড়োটা!

কোমর থেকে বিরাট আকারের ছোরাটা ডান হাতে তুলে নিয়ে এরিক ৩০৩ নম্বর ঘরের দরজায় মৃদু ঠকঠক শব্দ করল।

সাংঘাতিক চমকে উঠে বুড়ো বিল হেস চকিতে স্বর্ণমুদ্রাগুলি একটা থলেতে পুরে আলমারির তলায় লুকিয়ে ফেললো।

তারপর দ্রুত পায়ে দরজার কাছে এসে ছিটকিনি খুলে দরজা সামান্য ফাঁক করে প্রশ্ন করলো, কে?

আমি মিস্টার হেস। শুধু জানতে এসেছি—বলে বাক্য শেষ না করে একটি প্রবল চাপে দরজা খুলে চোখের নিমেষে বুড়োকে বাঁ হাতে চেপে ধরে ডান হাতে বিশাল ছুরিটা বুকের মধ্যে সমূলে ঢুকিয়ে দিল।

একটা আতঙ্কিত বিস্ময়ের অভিব্যক্তিতে মুখটা হাঁ হয়ে গেল বুড়োর! প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল সে। মুখ দিয়ে এতটুকু গোঙানী বা আর্তনাদ বের হল না। রক্তে ভেসে যেতে লাগলো ঘরের মেঝের কারপেট।

কয়েক মুহূর্ত বাদে দেখা গেল এরিক স্বর্ণমুদ্রা ভরা থলিটা বগলদাবা করে করিডোর দিয়ে তীর বেগে চলে যাচ্ছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে সে জন্মের মত সেই হোটেল বাড়ি ছেড়ে পগার পার হয়ে গেল।

এরিক কবহ্যামের জলদস্যু জীবনের এখানেই শুরু। এইটেই তার বোম্বেটে জীবনের গৌরচন্দ্রিকা।

ওদিকে নিয়তির পরিহাসে খুনের দায়ে পড়লো কিনা নির্দোষ হোটেল মালিক স্বয়ং এবং ফলে যথাকালে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়ে ফাঁসির মঞ্চে বেচারা প্রাণ দিল। একেই বুঝি বলে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে।

অবশ্য আর্ডেন্ট পটার নামক সেই হোটেল মালিক একেবারে

ধোয়া তুলসী পাতা ছিল না। তার মনেও একই পাপ ছিল। তবে সে কাজ হাসিল করতে একটু দেরীতে উক্ত ঘরে গিয়ে দেখে বুড়ো রক্তাক্ত হয়ে আছে। স্বর্ণমুদ্রা খোঁজাখুঁজি করবার মুখে অন্যান্য বোর্ডার এবং চাকর দরোয়ানদের দ্বারা ধৃত হয়ে বেচারা খুনের দায়ে চালান হয়ে প্রাণ দিল!

ইতিমধ্যে ধূর্ত এরিক কবহ্যাম ব্রিজপোর্টের পথে এগিয়ে চলেছে। মনোগত বাসনা জলদস্যুবৃত্তি। তার জন্য একটি জাহাজ ক্রয় করতে হবে। সংগ্রহ করতে হবে চেলাচামুণ্ডা সহযাত্রী বোম্বেটে মার্কা নাবিক দলকে।

শুনলে অবিশ্বাস্য মনে হয় জলদস্যুবৃত্তির প্রথম ক্ষেত্রেই একটি সুন্দরী সদাহাস্যময়ী তরুণীকে বিয়ে করে ফেললো সে। মেরিয়া লিণ্ডসে নাম্নী এই মেয়ে বিয়ে করে উপাধিই শুধু পাল্টালো না, হয়ে উঠলো সুযোগ্য সহধর্মিণী।

অর্থাৎ স্বামীর জলদস্যু নামক ধর্মকার্যের উপযুক্ত অংশীদার। শুকতারা বিশ্বে দেখা দিল অচিরে। অল্পকাল মধ্যেই এই হাস্যলাস্যময়ী তরুণী ঠাণ্ডা মাথায় নরহত্যা এবং নির্বিচার লুণ্ঠন কার্যে স্বামীকেও হার মানালো।

শুরু হলো ইতিহাসের এক নতুন বিস্ময়। জলদস্যু দম্পতি ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি দেখা যায় না।

শুধু এই নয়। সাধারণত এইসব দস্যুর যেভাবে জীবন শেষ হয়ে থাকে তা তো হলই না বরং এক অভাবনীয় পরিণতি হল এদের জীবনে।

বিশেষ করে এরিক কবহ্যামের। ভাবা যায় যে শেষ জীবনে এই জলদস্যু মানসম্মান ও ধনদৌলতের বিপুল অধিকারী হয়ে শেষে কিনা জজরূপে কালাতিপাত করবে!

এটাও ইতিহাসের এক বিস্ময়কর ঘটনা।

এবারে কি করে দুজনের দেখা হল সেই বৃত্তান্তে আসা যাক।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোং-এর 'স্টার অব ইণ্ডিয়া' নামক বিপুলকায় একটি বাণিজ্য জাহাজ রিভার মারসি ছেড়ে চীন দেশের উদ্দেশ্যে নীল সমুদ্র পথে তরতরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল একদা।

জাহাজের স্ট্রং বক্সের মধ্যে রয়েছে চল্লিশ হাজার পাউণ্ড স্টারলিং। চীন থেকে এ অর্থের বিনিময়ে কিনতে হবে আফিম এবং কিছু বহুমূল্যবান মণিমুক্তা রত্নসম্ভার।

ডেক-এর উপরে বাইনাকুলার চোখে দাঁড়িয়ে ছিল জাহাজের ক্যাপ্টেন হিলারী জোন্স। অকস্মাৎ তার নজরে পড়লো সন্দিগ্ধ চরিত্রের একটি জাহাজকে। জাহাজটা ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

পাশে দাঁড়ানো মেটের হাতে স্পাইগ্লাস (দূরবীক্ষণযন্ত্র) দিয়ে ক্যাপ্টেন বলে ওঠে, দেখ তো হিগিন্স, এ আবার কি জাহাজ।

যন্ত্রে চোখ রেখে হিগিন্স বলে, বেশ চটপটে চালু জাহাজ মনে হচ্ছে ক্যাপ্টেন। চৌদ্দটা কামানও রয়েছে দেখছি ওতে। আমাদের কাছে হয়ত কোন জরুরী সংবাদাদির খোঁজ করতে আসছে।

—উহুঁ, আমার কিন্তু জাহাজটাকে ভাল ঠেকছে না হে হিগিন্স। তুমি বরং প্রত্যেককে খবর দাও। কামানগুলোতে গোলাবারুদ ভরে প্রস্তুত থাকুক।

ঠিক আছে স্যার।—বলে মেট নেমে গেল নাবিকদের সংবাদ দিতে।

কিন্তু নাবিকরা উপরে এসে কামানগুলোর কাছে গিয়ে প্রস্তুত হবার আর সময় পেল না। বড় দেরী হয়ে গেছে তখন।

এরিক কবহ্যাম তার বোম্বেটে জাহাজে জলি কম্পেনিয়ন' নিয়ে বিদ্যুৎ বেগে এসে বড় বানিজ্য জাহাজটির গায়ে ভিড়ে গেছে ইতিমধ্যে।

কয়েক মিনিটে দুপক্ষের মধ্যে গোটাকয় গুলিগোলার আওয়াজ, ঝনঝনাঝন কিছু তরোয়ালের ঠোকাঠুকি। ব্যস লড়াই খতম। শত্রু হাতে বোম্বেটে দল বাণিজ্য পোত অধিকার করে নিল।

এই 'জলি কম্পেনিয়ন' জাহাজ এরিক কিনেছিল বুড়ো হেস-এর কাছ থেকে অপহৃত ৪০০ পাউণ্ড টাকার বিনিময়ে।

জনাকুড়ি গুণ্ডা ধরনের নাবিক ঝাঁপিয়ে পড়লো 'স্টার অব ইণ্ডিয়া' জাহাজের উপর। অতঃপর কয়েক মিনিটের মধ্যে বাণিজ্য পোতের ক্যাপ্টেন, মেটবৃন্দ ও নাবিক দলকে বন্দী কর ফেললো।

এই প্রথম হাতে খড়ি। এবং বউনি ভালই বলতে হবে। এইভাবে সূত্রপাত, এবং পরবর্তী প্রায় বিশ বছর ধরে একাদিক্রমে জলদস্যুবৃত্তি করে এরিক চারিদিকে আতঙ্কের সৃষ্টি করে ফেলেছিল।

যাইহোক এবার এই জাহাজের লুণ্ঠিত যাবতীয় মালের মধ্যে ছিল বুক ভর্তি সোনা সহ স্ট্রং বাক্সটি। তার ভেতরকার স্বর্ণমুদ্রা ও বেশ কিছু অলংকার দেখে বোম্বেটের মনটি চরম উল্লাসে চলকে উঠলো সন্দেহ নেই।

এরপর এল হত্যালীলার পালা। এরিকের মূলমন্ত্রই ছিল মড়া কখনো মিথ্যে কথা বা কথা বলে না। অতএব উড়িয়ে দাও। শত্রুর শেষ রাখতে নেই।

তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো চেলাচামুণ্ডার দল বন্দীদের ওপর এরিকের ইঙ্গিতে। নিমেষে সবাইকে কচুকাটা করে সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করে হাত পা ধুয়ে রক্ত পরিষ্কার করে নিল।

পরবর্তীকালেও এই পন্থা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছে এরিক। অর্থাৎ বন্দী নরনারী সবাইকে খতম করে নোনাজলে নিক্ষেপ করেছে।

যাই হোক, প্রথম জলযুদ্ধ জয়ের পর বলদর্পে দর্পিত এরিক প্লীমাউথ বন্দরে নিয়ে গিয়ে তার জাহাজ ভেড়ালো।

শহরে নেমে সে এদিক সেদিক বিচরণ করবার মুখে তার ভবিষ্যৎ স্ত্রীর সাক্ষাৎ বড় অদ্ভুতভাবে পেয়ে যায়।

লালরঙের লেসওয়ালা কোট, অদ্ভুত আকৃতির টুপী, রঙিন বড় সাইজের বোতাম সহ ক্যাপ্টেন এরিক কোবহাম প্লীমাউথের রাস্তা

ধরে যেতে যেতে দেখলো একটি সুন্দরী হাসিখুশি মেয়ে একট কর্দমাক্ত স্থান পার হতে ইতস্তত করছে।

তৎক্ষণাৎ নাইট-এব কায়দায় হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেল এরিক, মিস আমায় যদি অনুমতি করেন তো·· ।

সলজ্জ এবং কিছুটা বা ইতস্তত করে হাস্যময়ী মেয়েটি হাত বাড়িয়ে ধরলো এরিকেব হাত, মুখে বললে, অশেষ ধন্যবাদ স্যার আপনাকে···।

কিন্তু মজা এই যে কর্দমাক্ত স্থানটি পাব হবাব পবও মেয়েটি এরিখের হাত ছাড়বাব কোন লক্ষণ দেখালো না। অতএব এরিক এবং মাবিয়া লিগু:স নাম্নী যুবতীটি হাত ধবাধবি করেই পথ চলতে লাগলো।

মুখ বুজে অবশ্যই নয়। নানা কথা নানা আলোচনা, বিষয় .থকে বিষায়ন্তরে। এইভাবে দুজনেব মনেই দুজনেব প্রতি প্রত্যয় জন্মালো।

এই মেবিয়া সিগুসে নাম্নী যুবতীটি ভাল এক পরিবারের সন্তান। অনতিদীর্ঘাঙ্গী, ভাবি সুন্দব গঠনেব মেয়ে। সোনালী চুল, নীল বঙের চোখ, চিকন নাসিকা।

মিস, জানি না আপনি আমার সম্বন্ধে কি ভাবেন, যদি আমি বলি যে আমি একজন জলদস্যু।—মিষ্টি হেসে কোমল কণ্ঠে এরিক বলে ওঠে এক সময়।

আমি এটাকে মনে করব খুবই রোমান্টিক।—যুবতী সঙ্গে সঙ্গেই সপ্রতিভ জবাব দেয়, তবে আমি একথা বিশ্বাস করব না এটাও ঠিক।

—তাহলে অনুগ্রহ করে আমার জাহাজে বারেক পদার্পণ করুন, তাহলেই আশা করি আমি আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করতে পারব।

নতুন পাওয়া সখার সঙ্গে মেরিয়া গিয়ে উঠল 'জলি কম্পেনিয়ান' জাহাজে।

সেখানে গিয়ে অনেক কিছু দেখার পর সেই বাক্সটির প্রতি নজর পড়ল তার। 'স্টার অব ইণ্ডিয়ার' সেই বুকভরা সোনা ও অলঙ্কার সহ স্ট্রং বাক্সটি। চোখ ছানাবড়া আকার ধারণ করল মেয়েটির।

চোখ ঝলসানো সম্পদ দেখে মেরিয়ার মনে এক নতুন ভাবের উদয় হল। এ দলে ভিড়ে গেলে কেমন হয়? সে কি একজন জলদস্যু হতে পারে না? আনচান করে ওঠে মেরিয়ার মন।

মনোবাসনা শুনে ছলছলিয়ে ওঠে এরিক। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, একশবার হতে পারে সে জলদস্যু রমণী। কোন বাধা নেই হতে।

পরদিন নীরবে নিশ্চুপে প্লীমাউথে তাদের বিয়ে হয়ে গেল। প্রথম জলদস্যু ঘরণী এবং অচিরে সচিব ও অংশীদার।

তারপরই নবদম্পতি সহ 'জলি কম্পেনিয়ান' জলপথে এগিয়ে গেল তার লুণ্ঠন ও নরহত্যার সুদীর্ঘ জয়যাত্রা পথে।

স্বামীর কাছেই হাতে খড়ি। ন্যাড়াবাঁধা গুরু বলা যায়।

জাহাজ চলেছে সমুদ্রজল কেটে কেটে। নব-বিবাহিতাকে নিয়ে দুটি ডেক চেয়ারে বসে ছিল এরিক।

একথা সেকথার পর তালিম শুরু হল। পত্নীকে জলদস্যুতার প্রথমভাগের তালিম।

মেরিয়া,—এরিক বলে যায়, বোম্বেটে জীবনে ক'টি জিনিষ মনে রাখতে হবে অত্যাবশ্যকীয় রূপে।

প্রথমে ধরো, যেই শিকাররূপে কোন জাহাজ পাবে তার কাছে আচমকা গিয়ে আক্রমণ করতে হবে। বিস্মিত হবার সময়ও তাকে দেবে না। এর জন্যে প্রয়োজন শত্রুর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ উদ্রেক না করে মিত্রের মত এগিয়ে যাওয়া। ঐ জাহাজের একই নিশান ওড়াবে নিজের জাহাজে। এমন একটা ভাব করবে যেন বিশেষ কোন গুরুত্ব-পূর্ণ নির্দোষ ব্যাপারেই ওদের দিকে অগ্রসর হচ্ছ কিংবা ভাব দেখাবে তুমি কোন একটা বিপদে পড়েই সাহায্যের আশায় যাচ্ছ তার কাছে।

অতঃপর নিকটস্থ হয়ে যখন অ্যাকশনের সময় উপস্থিত হবে,

বিদ্যুৎ বেগে আঘাত হানবে দৃঢ় সংকল্প সহ। প্রথমেই গুলিবৃষ্টি করবে অফিসারগুলোর উপর। সাধারণত নাবিকরা বিশেষ বাধা দেয় না। কিন্তু সর্বস্ব হারাবার ভয় তো অফিসারগুলোরই, দায়িত্ব তো তাদের, তাই তারাই বাধা দেয় সর্বাধিক। অতএব প্রথমেই তাদের জখম করো, খতম করো। ওরা খতম হলেই সমগ্র জাহাজ তৎক্ষণাৎ আত্মসমর্পণ করে তোমার কাছে নতজানু হবে।

শেষ কথা হল, দয়ামায়াহীন নিষ্ঠুরতা। তুমি হবে নির্মম নির্ভীক নিষ্ঠুর। মনে রাখবে, মৃত মানুষ কোন কথা বলে না, বিপক্ষে যায় না। প্রত্যেককে তাই তরোয়ালের মুখে, পিস্তলের মুখে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। রেহাই কাউকে দেবে না।

সুযোগ্য ছাত্রীর মত মেরিয়া কবহ্যাম মনোযোগ সহকারে সব শুনে শিক্ষাগ্রহণ করতে লাগলো।

মৌখিক শিক্ষান্তে পরপর ছয়টি জলযুদ্ধে সুযোগ্য সহধর্মিণী মেরিয়া স্বামীর পাশে থেকে অংশ গ্রহণ করলো। বাস্তব শিক্ষা সমাপ্ত। অতি মেধাবী ছাত্রী সে।

কালক্রমে এই মেয়ে যাকে বলে গুরুমারা বিদ্যে তাই করে জলদস্যুতার পেশায় স্বামীকেও ছাড়িয়ে গেল। কেবিন ট্রাঙ্কে সদা সর্বদা আট-আটটি গুলিভরা পিস্তল রাখত সে। তারপর লড়াইকালে নিজেই তা পর পর ব্যবহার করত।

গুলির হাত ছিল তার অব্যর্থ। অবশ্য সে কখনো সাধারণ নাবিকদের মেরে হাত নষ্ট করত না। স্বামীর উপদেশানুসারে শুধু মাত্র অফিসারদেরই খতম করত এই মেয়ে নিজ হাতে।

আর 'জলি কম্পেনিয়ান'-এর জয়যাত্রার পথে মেরিয়ার অবদান অবিস্মরণীয়। এই মেয়ে দস্যুর নিষ্ঠুরতার জন্যেই স্বামীর পক্ষে নির্বিঘ্নে জাহাজের পর জাহাজ আক্রমণ করে তার নাবিকদল সহ সমস্ত অফিসারকে মেরে সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করে বিরামবিহীন লুণ্ঠন কার্য চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

মেয়ে জলদস্যুতার গ্রাজুয়েট হল মেরিয়া যেদিন সে 'ম্যানচেষ্টার মেইড' জাহাজটাকে কুক্ষিগত করল। এবং এই অভিযানেই মেরিয়া প্রথম তরোয়াল হাতে স্বয়ং এগিয়ে বেশ কিছু লোককে কচুকাটা করল।

ঘটনাটা এই রকম: যদিও পেলব রমণী মারিয়া, তবু তার কব্জির জোর ছিল সাংঘাতিক, আঘাত হানবার ক্ষমতাও অলৌকিক। ওর দেহানুপাতিক মাঝারি সাইজের একটি কালান্তক তরবারি ছিল। সেটা আর কাউকে ব্যবহার করতে দিত না সে। দুদিকেই তীক্ষ্ণ ধার, মাথাটি সুচ্যগ্র। নিজেই পাথরে বালি দিয়ে ঘস ঘস শব্দে ধার দিত। বড় আদরের অস্ত্র ওর সেটা।

যেদিন ওরা বিদ্যুৎ গতিতে গিয়ে 'ম্যানচেষ্টার মেইড' নামক জাহাজটিকে আক্রমণ করল, সে সময় জলদস্যু রমণী মেরিয়া তরোয়ালকে বজ্রমুষ্টিতে ডান হাতে ধরে সদম্ভে দাঁড়িয়ে ছিল।

স্বল্পস্থায়ী লড়াই। তড়িৎগতিসম্পন্ন সংকল্পে নিষ্ঠুর আক্রমণ। মিনিট পনেরর মধ্যেই রক্তাক্ত জাহাজ আত্মসমর্পণে বাধ্য হল।

এই—এই যে মশাই,—সহসা মেরিয়া চিৎকার করে ওঠে পলায়নপর একজন যুবক লেফটেনাণ্টকে দেখে। লোকটা গণহত্যা বুঝি কিভাবে এড়িয়ে গিয়েছিল।

হৈ হৈ করে বোম্বেটেদের ক'জন অফিসার যুবক ও আরও দুজনকে ধরে নিয়ে এল মেরিয়ার সামনে।

এরপর এক তাজ্জব কাণ্ড করে বসল বোম্বেটে মেয়ে। তীক্ষ্ণকণ্ঠে যুবক লেফটেনাণ্ট বন্দীকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, পোশাক খুলে ফেলো মিস্টার।

তার মানে!—বিস্মিত ভীত যুবক অফিসার বুঝি মৃদু আপত্তির ভঙ্গিতে বলতে চেষ্টা করে।

এই মুহূর্তে যা বলছি তাই করো। বজ্রকঠিন স্বরে আদেশ করে মারিয়া।

অনন্যোপায় বেচারা। চতুর্দিক ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে বন্দুক উঁচু করে বোম্বেটেরা। অনেকের হাতে উন্মুক্ত তরবারি। অসহায়ের মত বারেক চারদিকে তাকালো সে।

বাধ্য হয়ে প্রাণের দায়ে বন্দী ছোকরা সমস্ত পোশাক খুলে ফেলে শুধুমাত্র সামান্য আণ্ডার ওয়ার পড়ে দাঁড়িয়ে গেল। লজ্জায় সরমে সে মরে যাচ্ছিল।

হাসি হাসি মুখ নিয়ে যুবতী মেরিয়া তরোয়াল উঁচিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। অতঃপর একটি প্রচণ্ড ঠ্যালায় তলোয়ালটি ঢুকিয়ে দিল প্রায় বিবস্ত্র বন্দীর বুকে, এফোঁড় ওফোঁড় করে।

ফিনকি দেওয়া রক্তে আশেপাশের অনেকেই সিক্ত হল। এক ঝটকায় তরোয়াল খুলে আনলো মারিয়া। কিছুক্ষণ ছটফট করে প্রাণহীন নিস্তব্ধ হয়ে গেল বন্দী লেফটেনাণ্ট।

মেরিয়া মৃতের ছেড়ে রাখা ইউনিফর্ম নিয়ে ডেক ছেড়ে নিজ কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করল।

কিছুক্ষণ বাদে যখন সে ফের বেরিয়ে এল তখন তার অঙ্গে শোভা পাচ্ছে মৃত লেফটেনাণ্টের ইউনিফর্ম। নীল আর রূপোলী রঙের কুর্তা। সাদা সরু ব্রিচেস্, সিল্কের মোজা ইত্যাদি ইত্যাদি।

পরবর্তীকালে তীরে নেমে এই ধরনের বেশ কয়েকটি ইউনিফর্ম নিজের মাপে তৈরী করিয়ে নিয়েছিল মেরিয়া।

ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ এইচ. এম. এস. 'ফিউরীর' কম্যাণ্ডিং অফিসার লেফটেনাণ্ট ব্লেইন বাম বগলে টুপীটা নিয়ে ওপরওয়ালার আদেশ নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছিল।

বৃদ্ধ ক্যাপ্টেন ওয়ার্থরাইট লণ্ডনে তার অ্যাডমিরালটি ডেস্ক-এ বসেছিল। সামনে কতগুলি কাগজপত্র। সেগুলির পানে প্রায় মিনিটখানেক অপলকভাবে তাকানোর পর ক্যাপ্টেন গুরুগম্ভীর স্বরে বলে উঠল :—লেফটেনাণ্ট। আমার এখানে প্রায় কুড়িটি জলদস্যুর আক্রমণের সংবাদ রয়েছে বিভিন্ন মহাসাগরে। এর মধ্যে বহু জাহাজ

তার নাবিকদল ও যাত্রী সমেত চিরকালের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ঝড় নয়, তুফান নয়, শান্ত সমুদ্রে এভাবে একেবারে বেপাত্তা হয়ে যাওয়ার মূলে অবশ্যই বোম্বেটের আক্রমণ রয়েছে। খবর আছে এর পালের গোদা হল 'জলি কম্পেনিয়ন' নামক বোম্বেটে জাহাজ। সেটাকেই আমার পুরোপুরি সন্দেহ হচ্ছে এই সব সর্বনাশের আসল আসামী হিসেবে। এই কুখ্যাত জাহাজ মনে হয় প্লীমাউথের কাছাকাছি সমুদ্রেই হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। তুমি 'ফিউরী' জাহাজাকে ঐ অঞ্চলে নিয়ে যাবে এবং সর্বশক্তি প্রয়োগ করে হয় ওটাকে পাকড়াও করবে নয়ত অতল সমুদ্রে ডুবিয়ে দেবে চিরদিনের মত। এই আমার আদেশ। তোমার কোন প্রশ্ন আছে কি এ বিষয়ে ?

—ঐ জাহাজের জলদস্যুর নাম জানা আছে কি স্যার ?

হ্যাঁ এবং না।--গভীর চিন্তামগ্ন ক্যাপ্টেন উদ্ভট কণ্ঠে বলে উঠলো, শুনলে তাজ্জব মনে হয়, অথচ শোনা যায় ঐ জাহাজ নাকি পরিচালিত হচ্ছে শুধু একজন জলদস্যু নয়, একজোড়া নরনারী অর্থাৎ বোম্বেটে দম্পতির দ্বারা। উপাধি শুনেছি কবহ্যাম। সে যাইহোক ওরা জেনে রেখো ভয়ংকর রক্তপিপাসু এক দম্পতি। সব সময় সদা সতর্ক হয়ে ওদের পিছু ধাওয়া করবে।

—বুঝলাম। আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করব স্যার।

এরপর প্রায় ধরে ফেলেছিল 'জলি কম্পেনিয়নকে' এইচ. এম. এস. 'ফিউরী'। প্রায় ধরেছিল কিন্তু পরিপূর্ণ ধরতে পারেনি। এক বিকেলে অদূরে দেখা গেল বোম্বেটে জাহাজ। কবহ্যাম টের পেল যে তাকেই ধরতে আসছে যুদ্ধ জাহাজটি।

জল ছিটিয়ে পাল ভিজিয়ে তাদের বাতাস ধরবার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিল কবহ্যাম। এবং যুদ্ধ জাহাজকে পিছনে ফেলে বহুক্ষণ রেস দেবার পর রাত্রির অন্ধকারে এক সময় অনুসরণকারী জাহাজের দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল আর পরদিন অতলান্তিক পাড়ি দেবার উদ্দেশে দীর্ঘ যাত্রা শুরু করল।

ব্লক আইল্যাণ্ডের উপকূলে পৌঁছে সুন্দরী স্ত্রীর সলাপরামর্শ মত ঐ নির্জন দ্বীপের কোন এক স্থানে ১৬০০০ স্বর্ণ গিনি মাটির তলায় পুঁতে লুকিয়ে রাখলো। জাহাজে আরও বহু লুটের মাল ছিল সেগুলোকেও সেইখানেই লুকিয়ে রেখে এল।

এ সংবাদ জানা যায় এরিক কবহ্যামের গোপনে মুদ্রিত আত্ম-জীবনী থেকে। দুঃখের বিষয়, উক্ত ধন-সম্পদ, রত্ন-মাণিক্য কোনদিন আর উদ্ধার করা যায় নি। এর পর আমেরিকায় থাকাকালীন কিছুকাল ওরা "জলি কম্পেনিয়ন" ছেড়ে বড় একটা জাহাজ নিয়ে কাজ করেছিল।

এই জাহাজ নিয়ে লণ্ডন থেকে কুইবেক যাওয়ার সময় তিন তিনটে জাহাজকে ওরা ধরে লুঠ করেছিল এবং ডুবিয়ে দিয়েছিল।

এর মধ্যে একটি জাহাজের নাম ছিল 'লায়ন'। শোনা যায় ঐ জাহাজের মাস্টার এবং যাবতীয় মেটদের শেকলে বেঁধে সুন্দরী মেরিয়া তার প্রিয় আটটি পিস্তল দিয়ে এক এক করে হাতের সুখ করেছিল অর্থাৎ প্রত্যেককে গুলি করে হত্যা করেছিল।

এখন আমরা যাকে বলে বিরাট ধনী, বলো ?— একদিন মেরিয়া তার স্বামীকে কেবিনে বসে কথার ছলে বলে, আর কেন, এবার চলো ইউরোপে ফিরে যাই এবং এ পেশা থেকে অবসর নিয়ে ডাঙায় জীবন যাপন করি। তুমি একটা ভাল দেখে জমি, বাড়ী কিনতে পারো। তারপর দুজনে আমরা ভদ্র, সম্ভ্রান্ত জীবন যাপন করব শেষের দিনগুলো। সত্যি বলতে কি জাহাজের এই কেবিনে বসবাস করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি, হাঁপিয়ে উঠেছি বলা যায়।

এরিক কবহ্যামও অবসর নেওয়ার কথা বুঝি মনেমনে ভাবছিল। অতএব বোম্বেটে দম্পতি পূর্বদিক পানে যাত্রা করে ফিরে এল ইংলণ্ডে।

সেখানে পুলে নামক স্থানে সম্পত্তি কেনবার কথাবার্তা চালালো এরিক। স্বামী যখন জমি দেখে এবং দরকষাকষি নিয়ে ব্যস্ত, সেই

ঝোঁকে চঞ্চলা মেরিয়া তাদের জাহাজ নিয়ে আরেকটা শিকার ধরতে গেল।

নিজের পরিচালনায় সে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোং-এর 'লাহোর প্রিন্স' নামক একটা জাহাজকে পাকড়াও করে ফেললো এবং একটি নতুন ও অভিনব প্রক্রিয়ায় শত্রুপক্ষের সবাইকে হত্যা করল। কোমরে দড়ি বেঁধে দাঁড় করিয়ে তাদের ফুটন্ত গরম বিষ মিশ্রিত স্টু খাইয়ে শেষ করা হল এবং হতভাগ্যদের দেহগুলি শেকলবাঁধা অবস্থায় নোনাজলে ফেলে সলিল সমাধি দেওয়া হল। অতঃপর শেষকৃত্য হিসাবে লুঠকরা লাহোর প্রিন্সকে ডুবিয়েও দেওয়া হল। তারপর নিষ্ঠুরা রমণী ফিরে এল বন্দরে।

ইংলণ্ডে হল না। এবিক জমি, সম্পত্তি কিনলো ফরাসী দেশের লে হেভারে নামক সমুদ্রের মুখোমুখি এক স্থানে।

মেরিয়া ও এরিক বোম্বেটেগিরির জাহাজ ও অন্যান্য যাবতীয় বস্তু বিক্রি করে সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত জীবন যাপন করতে শুরু করলো লে হেভারেতে।

কিন্তু হলে হবে কি, এত আভিজাত্য ভালমানুষী বুঝি মেরিয়ার আদৌ ভাল লাগলো না। সে এমনিতেই বেশ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এর উপর স্বামী এরিক কবহ্যাম যখন স্থানীয় এক জজের পদ গ্রহণ করল, তখন মেরিয়ার আর সহ্য হল না।

ঘর ত্যাগ করে সে যাযাবর জীবনে বেরিয়ে পড়ল। বেশীদিন চললো না। অনতিকাল পরেই সমুদ্রতীরে অর্ধভুক্ত এক বিষের শিশি ও গাউন পাওয়া গেল।

যথাসময়ে পরদিন তার দেহ ভেসে এল সমুদ্রতীরে বেলাভূমিতে প্রাণহীন জলখাওয়া ফোলা বিকৃত এক দেহ। ভদ্রজীবন মেরিয়ার বুঝি এমনই অসহ্য হয়েছিল যে প্রাণ দিয়ে সে জীবন থেকে পরিত্রাণ পেয়ে গেল।

এরিক কবহ্যাম অবশ্য স্থানীয় কাউন্টি জজ হয়ে বহুদিন সম্ভ্রান্ত

অভিজাত জীবন যাপন করে গেছে। অতঃপর মৃত্যুর পদধ্বনি শুনে তার জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি লিখে নিজে প্রেণ্ট-এর কাছে দিয়ে বলেছিল এটা যেন তার মৃত্যুর পরে ছেপে প্রকাশ করা হয়।

তারপর দেহত্যাগ করে সে মাননীয় ব্যক্তিরূপে।

ছয়

ডাইনী দ্বীপই বলবো তাকে।

কেননা সেই দ্বীপে অবিশ্বাস্য অকল্পনীয় পরিমান সোনা রূপা ধনরত্নাদি লুক্কায়িত রয়েছে।

অথচ বিভিন্ন দেশের মানুষজন প্রায় ১০০ বছর ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে সেই গুপ্তধন উদ্ধারের।

কিন্তু হায়, সবাই করুণ ভাবে বিফল হচ্ছে, আর অকৃত কার্য হচ্ছে। ধনে প্রাণে বিপর্যস্ত হয়ে কেউ কেউ দেহ রক্ষা করেছে সেই দুর্ভেদ্য জঙ্গলে, নয়ত হতোদ্যম ভগ্ন স্বাস্থ্য চিররুগ্ন হয়ে ফিরে এসেছে যার যার স্বদেশে।

কত সোনা রূপা ধনরত্ন লুক্কায়িত আছে সেই দ্বীপটিতে? আজগুবী সেই পরিমান শুনলে বিশ্বাস হতে চায় না।

তার আর্থিক মূল্য হবে ১৫০ কোটি টাকারও অধিক।

কোথায় সেই দ্বীপ? কি তার নাম?

মধ্য আমেরিকার রিপাবলিক রাষ্ট্র কোস্টারিকার অধীনস্থ এই দ্বীপটির অবস্থান পানামা কেনেলের খাড়া পশ্চিম দিকে ৫৫০ মাইল দূরের মহাসাগরে। নাম কোকোজ।

অতি জঘন্য এর আবহাওয়া। বর্ষায় স্যাঁতস্যাঁতে আর্দ্র। নিবিড় ঝোপ জঙ্গল, লোমশ বিদঘুটে ইদুর, হাজার রকমের মারাত্মক পোকা-মাকড় কীটপতঙ্গ অধ্যুষিত জনমানবহীন এই অভিশপ্ত যক্ষদ্বীপ।

সমুদ্রবেলা চোরাবালি আকীর্ণ আঠারো বর্গমাইলের এই দ্বীপের কোন এক অজ্ঞাত গুহায় না কি মাটির নীচে একাধিক স্থানে লুক্কায়িত অবস্থায় রয়েছে পূর্বোক্ত তাজ্জব পরিমান ধনরত্ন।

এই দ্বীপ এবং এই সঞ্চিত ধনরত্নের ইতিহাস হল তদানিন্তন কালের একাধিক প্রখ্যাত ও কুখ্যাত জলদস্যু বোম্বেটেদের ইতিহাস। তাই এ পাণ্ডব বর্জিত অখাদ্য স্থানটির কাহিনী এসে পড়লো।

এ কাহিনী বলতে গেলে আমেরিকার কিছু ইতিহাস এবং বোম্বেটে দস্যুদের কাহিনী অবধারিত ভাবে এসে পড়ে।

আমেরিকা আবিস্কারের পর, সেখানে ইয়োরোপ থেকে বহু লোক চলে আসে এই নতুন দেশে বসবাস করতে।

উত্তর আমেরিকার ইংরেজ অধীন এই সব উপনিবেশের লোকেরা একদা বিদ্রোহ এবং বিপ্লবান্তে স্বাধীনতা লাভ করে।

ওদিকে দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনীয় নিউ ওয়ার্ল্ড এম্পায়ারে দেখা দেখি বিদ্রোহ করে ওঠে ল্যাটিন আমেরিকার রাজ্যগুলি। এসব ঘটনা আমাদের এ কাহিনীতে আসবে পরে।

তাহলে আরও আগের অর্থাৎ একেবারে শুরুর ইতিহাস দিয়েই আরম্ভ করা যাক:

স্পেনের তখন বোল বোলাও স্বর্ণযুগ। যাতে হাত দিচ্ছে সোনা ফলাচ্ছে।

কিছুসংখ্যক বেপরোয়া স্পেনীয় নাবিক জাহাজ নিয়ে পাল তুলে এল আমেরিকায়। এর পর আরেক দল এল গোলাগুলি তরবারি নিয়ে। এই সব অস্ত্র শস্ত্র আর বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে তারা দলের পর দল রেডইণ্ডিয়ান বাহিনীকে ধ্বংস করে দিল।

একের পর এক মহান উপজাতীয় দলেরা পরাজিত হল। করটেজ নামক এক নিষ্ঠুর সৈন্যাধ্যক্ষের হাতে প্রথম বলি হল মেক্সিকোর রাজকীয় অ্যাজটেক সম্প্রদায়। পেরুর ঐশ্বর্যশালী ইনকা সাম্রাজ্য

স্পেনের নিম্ন বংশ জাত এক জারজ সন্তান, নাম ফ্রান্সিস্কো পিজরো, তার পদতলে পিষ্ট হয়ে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেল।

আর এই অরাজকতায় বিজিত উপজাতী ও সাম্রাজ্যের কাছ থেকে স্পেনীয়রা লুণ্ঠন করে নেয় প্রকৃত পক্ষে শতশত টন ঝিকমিকে সোনা, চিক চিকে রূপো আর চোখ ঝলসানো সংখ্যাতীত এবং দুষ্প্রাপ্য মহামূল্যবান পাথর রত্নাদি।

হরণ করা মহা মূল্যবান এই সব সম্পদের কিছু অংশ সরা-সরি স্বদেশে স্পেনে পাচার হয়ে গেল।

বাকি অধিকাংশ মাল রইল এই নতুন জগতের সরকারের এবং চার্চের মাটির তলায় গুপ্ত সব স্থানে বাক্সবন্দী হয়ে।

কথায় আছে ধন ও ধনীরা চোর-ডাকাতদের আকর্ষণ করে চুম্বক টানে। আবার সে ধন যদি হয় লুটেরা মাল তাহলে শত শত দুর্বৃত্তের নজর সেদিকে ধাবিত হয়।

অতএব অনিবার্য ভাবে এক সময় জলদস্যুরা হা রে রে করে এগিয়ে এল। এবং তাদের বিদ্যুৎগতি নৃশংসতার মাধ্যমে আমেরিকার খনি থেকে আহৃত ও সঞ্চিত বিপুল স্বর্ণরৌপ্যের ভাণ্ডার অচিরে খালি করে নিয়ে উধাও হল।

ভাঁড়াররূপী গ্রীন বীচ্ বা কোকোজদ্বীপ এইখান থেকেই পাদ-প্রদীপের সামনে এল। শুরু হল তার ইতিহাস। এই গুপ্তধনের রাজ্যের ইতিহাস এবং তখনকার জলদস্যু বোম্বেটেদের ধনরত্ন অপহরণের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

তিনটি বিভিন্ন বোম্বেটেদলের সঞ্চিত ধনরত্নে তথাকথিত ধনী বনে গেল এই যমের অরুচিমার্কা আবহাওয়া সমন্বিত নিরালা দ্বীপ কোকোজ।

প্রথম সঞ্চয়ের বউনী যে করে তার নাম: এডওয়ার্ড ডেভিস। প্রখ্যাত জলদস্যু। সেই প্রথম অবতরণ করে পাণ্ডববর্জিত ঐ দ্বীপে। কুখ্যাত জলদস্যু জন কুকের প্রধান সহচর এই ডেভিস। কুকের মৃত্যুর পর তার স্থানে অধিষ্ঠিত হয় ডেভিস।

পিস্তল, তরবারি চালনায়, অসম দুঃসাহসিকতায় আর প্রখর বুদ্ধিমত্তায় ব্রিটিশ সন্তান এই ডেভিস সপ্তদশ শতাব্দীর জলদস্যুদের মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত হয়ে উঠেছিল।

ঐ কোকোজ আইল্যাণ্ড ছিল তার হেডকোয়ার্টার। এখান থেকে সে কালিফোর্ণিয়া থেকে গুয়াইযুল পর্যন্ত নিউ স্পেনের সমস্ত উপকূলভাগে হানা দিয়ে ফিরত।

এক সময় ডেভিস পানামা উপসাগর অবরোধ করে, নিকারাগুয়াকে তছনছ করে এবং পেরু ও চিলি পর্যায় ক্রমে আক্রমণ করে।

এই সব অভিযানে সে যা লুণ্ঠন করেছিল, তার অংশ বিশেষ দলীয় লোকেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করেও সে যে পরিমান ধনরত্ন সোনারূপা হীরে জহরৎ ঐ দ্বীপের বিভিন্ন স্থানে প্রোথিত করে, সংবাদে প্রকাশ তার আর্থিক মূল্য কম করে সাড়ে সাত কোটি টাকা।

পরে ডেভিস ভাল মানুষ সাজবার ফন্দী করে ইংল্যাণ্ডে চলে যায়। সেখানে গিয়ে রাজা দ্বিতীয় জেমসের কাছ থেকে ক্ষমা প্রাপ্তির পর ভার্জিনিয়ায় ফিরে এসে ভদ্র চাষী হয়ে যায়। তামাকের চাষ করত হাতে, মনের মধ্যে ঘুরছে সেই কোকোজ দ্বীপে লুকিয়ে রেখে আসা গুপ্তধনের কথা।

চৌদ্দ বছর পরে ঐ ধনরত্ন পুনরুদ্ধারের মানসে সে ব্লেকিং নামীয় ক্ষুদ্র এক জলযান নিয়ে কোকোজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

কিন্তু কথায় বলে স্বভাব যায় না মলে।

পথে যেতে যেতে ফের সে জলদস্যুতায় নেমে যায়। জাহাজ ঘোরালো পোর্টোবেল্লোর দিকে। এটাই বুঝি নিয়তি ওর কাল। সেখানে পৌছে সে প্রাচীন শহর আক্রমনের মুখে স্পেনীয়দের প্রচণ্ড কামানের গোলায় তার ক্ষুদ্র জাহাজ চুর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। ডেভিসেরও মৃত্যু হয় সেখানেই।

এর পর দুশো বছর কেটে যায়।

ঐ কোকোজ দ্বীপে এর মধ্যে কোন মনুষ্য পদার্পণ করেছিল কিনা সে সম্বন্ধে সঠিক রেকর্ড নেই। তবে শোনা যায় ইংরেজ তিমি শিকারী জাহাজ কখনো সখনো প্রয়োজন বোধে ওর তীরে ক্ষণিকের বিশ্রাম নিত।

দ্বিতীয় যে জলদস্যু এরপর এই দ্বীপে এল তার নাম বেণ্টে গ্রাহাম। এও ব্রিটিশজাত। এর পেশাগত নাম ছিলঃ বেনিটো অব দি ব্লাড থার্স্টি সোর্ড।

গ্রাহাম ছিল ব্রিটিশ নৌবাহিনীর এক বীর অফিসার। একদা ট্রাফালগারের যুদ্ধে নেলসনের সঙ্গে থেকে লড়ে প্রচুর নাম কিনে ছিল।

ইংল্যাণ্ডে এই সুন্দর চেহারা ও সুন্দর চুল সমন্বিত অভিজাত ভদ্রলোক স্বনামধন্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কি যে ছিল বিধাতার মনে। দুর্মতি আর কি। এ কিনা হয়ে গেল জলদস্যু।

জলদস্যু হওয়ার ইতিহাসও বড় চমৎকার।

জাহাজের চাকরী। এই জাহাজে গ্রাহাম একটি রূপবতী সুন্দর-কেশী যুবতীকে নিজ কেবিনের এক বাক্সে লুকিয়ে নিয়ে ফিরত। সে ছিল ওর অঙ্কশায়িনী প্রিয়া।

বেথ পার্কার নাম্নী এই মেয়ে খুবই চালাক চতুর চৌকস। উদগ্র যৌবন ও সীমাহীন লালসাময়ী এই মেয়েটির নাকি লোভের অন্ত ছিল না।

সেরা সেরা বস্তু সে চাইত এবং অচিরেই লাভ করত। যা-তা দ্রব্যসামগ্রীতে তার মন ওঠেনা। আহার, পরিধেয় এবং অলঙ্কারাদির প্রতি আকর্ষণ ছিল তার নিদারুণ।

কিন্তু সাধারণ উপার্জ্জনশীল গ্রাহামের পক্ষে সে চাহিদা নিয়মিত মেটানো ক্রমশই অসাধ্য হয়ে উঠেছিল।

নিয়তি খেলা শুরু করল। এক নতুন সুযোগ এল গ্রাহামের। সরকার তাকে পানামা অঞ্চলে জরীপের কাজ করবার জন্য একটি জাহাজের অধ্যক্ষ করে সমুদ্রযাত্রা করিয়েছিল।

নতুন জাহাজেও গ্রাহাম লোক চক্ষুর অন্তরালে সেই মেয়ে বেথ পার্কারকে সকলের অজ্ঞাতে নিজ কেবিনে নিয়ে তুললো।

জাহাজ ডোভার বন্দর ছেড়ে গেল। গ্রাহাম তার ভবিষ্যৎ অভিনব পরিকল্পনা স্থির করে নিয়েছিল মনে মনে।

বন্দর ছাড়বার কিছু পরেই সে তার নাবিকদের ডেকে তার মনোগত বাসনার কথা অকপটে ব্যক্ত করল।

নাবিকদের বললে, বন্ধুগন, এই অমানুষিক পরিশ্রমের জরিপের কাজে যে নগন্য বেতন সরকার তোমাদের দেবে তাতে ধরতে গেলে জাতও যাবে পেটও ভরবে না। কি বল ভাই? সত্যি কিনা বল? এখন তোমাদের ভেবে দেখতে অনুরোধ করব বন্ধুগন এই স্বল্প বেতনেব কাজ করে অর্ধভুক থাকবে নাকি আরেকটি অতিলোভনীয় কাজ করে প্রচুর আয়ের ব্যবস্থা করবে?

কি কাজ? কি কাজ? বলুন স্যার কি সে কাজ?

সে কাজ হল, গ্রাহাম এবার খুলে বললে. জলদস্যুতার কাজ। এর চেয়ে লাভজনক কাজ আর নেই। এ কাজ প্রকৃত মরদের কাজ। রাজারাজড়ার মত উপার্জন।

শুনে সবাই উল্লসিত গুঞ্জনে মুখরিত করে তুললো জাহাজের ডেক।

আর সে দিন থেকেই জন্ম নিল দুর্ধর্ষ এক জলদস্যু যার নাম হল "বেনিটো অফদি ব্লাড থার্স্টি সোর্ড" যাকে বাংলা করলে দাঁড়ায় শোনিত তৃষ্ণ তরবারি ধারক বেনিটো।

সহজাত ক্রিমিনাল জলদস্যুর চেয়ে এই অ্যামেচার বোম্বেটে সমধিক পাকা হয়ে উঠল।

আজ যদি জাহাজ লুট করে তো কদিনের মধ্যেই প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে তীরে ডজনখানেক নগর বন্দরে হানা দেয়। একবার তো দেশের সুদূর অভ্যন্তর ভাগে ঢুকে গিয়ে বিরাট এক খচ্চরবাহিনী বাহিত প্রচুর ধনরত্ন নির্বিঘ্নে সাফল্য সহকারে ছিনতাই

করে নিয়ে এল। সেখান থেকেই একমাত্র লুটের পরিমান আর্থিক মূল্যে হল আড়াই কোটি টাকা।

সর্বসাকুল্যে বেনেট গ্রাহাম সাড়ে বারো কোটি টাকার মত সম্পদ লুণ্ঠন করেছিল।

কোথায় রাখা যায় আইনের চোখে ফাঁকি দিয়ে এই বিপুল সম্পদ। দুশো বছর আগেকার ডেভিসের মত সে ও উক্ত কোকোজ দ্বীপকেই বেছে নিল প্রকৃষ্ট স্থান হিসেবে, একবার দুবার তিনবার সে গিয়ে তিনক্ষেপে লুটের মাল ওখানে লুকিয়ে রেখে আসে।

কালক্রমে বেনিটো অফ দি ব্লাড থার্স্টি সোর্ড হয়ে উঠেছিল দুর্নিবার এক সম্পদশালী ধনী জলদস্যু।

সামুদ্রিক ট্র্যাফিক অর্থাৎ সওদাগরি জাহাজের ভয়াবহ শত্রু হয়ে উঠেছিল গ্রাহাম। শুধু স্পেনীয় নয়, স্বদেশী ব্রিটিশ জাহাজও শিকার করতে শুরু করলো।

একবার ব্রিটিশ সরকার একটি যুদ্ধ জাহাজ পাঠিয়ে দেয় ওকে পাকড়াও করবার মানসে। পরিণতি হল বিপরীত।

সেই যুদ্ধ জাহাজ জলদস্যু গ্রাহাম লড়াই করে করতলগত করে ফেললো। কী আনন্দ কী বিজয়। অতএব বিজয়োৎসব পালিত হল পিপে পিপে মদ গিলে আর বেথ পার্কারকে নিয়ে কেবিনের দরজা বন্ধ করে।

বার বার কিন্তু ঘুঘুদের ধানখাওয়া সম্ভব হল না। দ্বিতীয় ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ এল একই উদ্দেশ্য নিয়ে।

বুয়ানা ভেঞ্জুয়া উপসাগরে গ্রাহামদের কোনঠাসা করে ফেললো ব্রিটিশ রণতরী। কয়েক ঘণ্টার তুমুল লড়াই। ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে জলদস্যুদের জাহাজ কিছুক্ষণের মধ্যে চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে জলসমাধি লাভ করল।

গ্রাহাম ও তার বাকি জীবিত সাঙ্গাৎদের ভাসমান অবস্থায় জল থেকে তুলে সেই ব্রিটিশ রণতরী সুদূর ইংল্যাণ্ডে নিয়ে গেল

বিচারান্তে গ্রাহাম ও তার সঙ্গী সাথীদের প্রকাশ্য স্থানে ফাঁসী লটকে ভবলীলা সাঙ্গ করে দেওয়া হল।

মজার কথা কিছু পুরুষ জলদস্যুর সঙ্গে যৌবনবতী রক্ষিতা বেথ পার্কার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মেয়াদ নিয়ে সুদূর টাসমানিয়ায় "ক্রিমিনাল কলোনী"তে দ্বীপান্তরে চলে যায়।

দীর্ঘ বিশ বছর বাদে এই স্ত্রীলোকটি ফিরে আসে। আশ্চর্য, অনন্ত যৌবনা উর্বশী যেন। সে বয়সেও পুনরায় বিয়ে করে চলে গেল নিউইয়র্ক।

মনোগত বাসনা ছিল গ্রাহামের লুকিয়ে রাখা ধনসম্পদ পুনরুদ্ধার করা কোকোজ দ্বীপ থেকে। মানচিত্র ওব আছে। লোক লস্কর চাই। কিন্তু এ আশা তার পূর্ণ হয় নি। অভিযানকারী উৎসাহী লোক জোটানো যায় নি।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে গ্রাহামের যুগ শেষ।

এবার ফিরে যাই সেই প্রথম লেখা কথায়। অর্থাৎ ল্যাটিন আমেরিকার রাজ্যগুলি উত্তর আমেরিকার তেরটি রাজ্যের কাছে শিক্ষা লাভ করে, প্রেরণা পায় এবং সেখানেও দেখা দেয় বিদ্রোহ এবং বিপ্লব।

বিদ্রোহী সেনাদল স্পেনের নিউওয়ার্ল্ড সাম্রাজ্যকে কাঁপিয়ে তোলে। বিদ্রোহী-সেনাদল ক্রমশ এগিয়ে এসে সরকারী সেনাদলকে পরাজিত করতে থাকে।

ত্রাহি ত্রাহি রব পড়ে যায় অতুল বৈভব ও সম্পদশালী নগরী লিমা পেরুর ধনশালী মানুষেরা বিদ্রোহের আতঙ্কে থরহরি কম্পমান হয়ে যায়।

ধনী ব্যক্তিরা তাদের যাবতীয় সম্পদ ঝটিতি বাক্স ও সিন্দুকে ভর্তি করতে থাকে। গরীবরাও পোটলা পুটলি খচ্চরটানা গাড়িতে চাপিয়ে পালাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল, সমস্ত নগরীর মানুষের মন অজ্ঞাত এক বিভীষিকার আতঙ্কে হতভম্ব হয়ে রইল। অজানা আশংকার কালো ছায়া যেন তিমিরাচ্ছন্ন করে ফেললো তাদের।

সংবাদ এসেছে ফ্যান মার্টিনের বিজয়ী ইণ্ডিয়ান বিপ্লবীরা লিমা শহর থেকে নাকি আর মাত্র ৫৮ মাইল দূরে রয়েছে এবং ঝটিকাগতিতে নগরীর পানে অগ্রসর হচ্ছে।

সর্বাধিক আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠল স্পেনীয় সরকারী কর্মচারী এবং ধর্মযাজক সম্প্রদায়। আতঙ্কিত হবার তাদের যথার্থ কারণ ছিল।

সমুদ্র পথে জলদস্যু এবং সম্প্রতি বিপ্লবীদের দ্বারা যারপর নাই বিপদসংকুল হয়ে যাওয়ায় স্পেনের রাজাকে বাৎসরিক দেয় লক্ষ লক্ষ ডলার মূল্যের স্বর্ণ-রৌপ্য মণি-রত্ন রূপ-নজরানা, স্থানীয় সরকারী গুদোমের ভল্টে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। এ ছাড়া খনি থেকে সদ্য-তোলা প্রচুর পরিমান স্বর্ণ-রৌপ্য টাঁকশাল ব্যাঙ্কে জমা হয়ে বেশ জমে রয়েছে।

হায় হায়, এই সব অগুনতি ও অতুল বৈভব কি শেষ পর্যন্ত ঐ বজ্জাত বিপ্লবী ইণ্ডিয়ানদের হাতে তুলে দিতে হবে নাকি ?

ধনী ধর্মযাজক সম্প্রদায়েরও একই ভয় ভীতি। তদানিন্তন কালে লিমাতে ৬০টি গীর্জা ও ক্যাথিড্রাল বর্তমান ছিল। প্রতিটির সঞ্চয়েই ছিল আজগুবী পরিমান স্বর্ণ-রৌপ্য রত্নাদি, তৈজস পত্র; কাপ মেডেল মোহর এবং ধাতব মূর্তি সমূহ।

লিমার প্রধান ক্যাথিড্রালে প্রায় দেড় কোটি টাকা মূল্যের মানুষ সমান প্রমাণ সাইজের ভার্জিন মেরীর একটি শুধু সোনা দিয়ে তৈরী মূর্তি ছিল।

শত্রুরা যখন প্রায় দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছে এ সময়ে এই সব মহামূল্য ও অমূল্য সম্পদগুলিকে বাঁচানো যায় কি ভাবে? এই চিন্তায় সবার মাথা খারাপ হবার দাখিল হল।

সরকারী অফিসার এবং ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমুল আলোচনা, তর্কাতর্কি, মতান্তর, মনান্তর শুরু হয়ে গেল প্রবল ভাবে। হায়, এরই পরিণতি স্বরূপ সেই অভিশপ্ত কোকোজ দ্বীপে ফের জমা পড়ল আরেক দফা ধনরত্নাদির বিপুল বৈভব।

কিভাবে তাই বলি :

স্পেনীয় ভাইসরয় বললে, এখন এসব নিয়ে একমাত্র পরিত্রাণের পথ হল সমুদ্রপথ। ক্যালাও বন্দরে নোঙর করা একটা জাহাজে আমাদের সমস্ত ধনরত্ন সোনাদানা প্রভৃতি যাবতীয় সামগ্রী-তুলে এখুনি তাকে সমুদ্রে পাঠিয়ে দিতে হবে।

প্রতিবাদ এল ধর্মযাজকদের এক প্রধানের কাছ থেকে, কিন্তু স্পেনদেশে যাবার সিকি পথেই যে সে জাহাজকে ধরে ফেলবে ওরা।

—ওরা কারা ?

—কেন চিলির নৌবাহিনী। তারা তো আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওৎ পেতেই বসে আছে।

—না এ জাহাজটা স্পেনে যাবে না, ভাইসরয় বলে।

—স্পেনে যাবে না ? তাহলে যাবে কোথায় ?

—কোথাও যাবে না, ভাইসরয় এবার বিশদ ব্যাখ্যা করে বলে, যে জাহাজের কথা বলছি সেটা স্পেনীয় জাহাজও নয়। আমি একটি চমৎকার পরিকল্পনা করেছি। আমরা বিদেশী একটি জাহাজের খোলে আমাদের নগরীর ধনরত্ন ও যাবতীয় অস্থাবর ঐশ্বর্য তুলে দেব। আমাদের ছয়-সাত জন বিশ্বস্ত কর্মচারী সে জাহাজে যাবে পাহারা স্বরূপ। জাহাজের ক্যাপ্টেনকে বলে দেব, কোন নির্দিষ্ট স্থানে জাহাজ যাবে না। শুধুমাত্র বিপদ সীমানা অঞ্চলের বাইরে যতদিন না ফের লিমাতে ফিরে আসবার মত অবস্থা হয়, ততদিন ঐ জাহাজ সমুদ্রের মধ্যে এদিক ওদিক টহল দিয়ে ফিরবে, ভেসে বেড়াবে।

—কোন জাহাজ সেটা ? ক্যাপ্টেনই বা কে ? জনৈক বিশপ প্রশ্ন করে বলে, এমন কোন্ বিদেশী যাকে আমরা এতটা বিশ্বাস করতে পারি ?

—জাহাজের নাম "মেরী ডিয়ার"। আর ক্যাপ্টেনের নাম হল থমসন, বলে ভাইসরয় তার বিশদ পরিচয় বললে।

জেমস থমসন। স্কটল্যাণ্ডের লোক। বলিষ্ঠ গাট্টাগোট্টা চেহারা।

খুবই আমুদে ধরনের মানুষ। বেশ কয় বছর ধরে সে এই অঞ্চলের তীরভূমি বরাবর বাণিজ্য করে যাচ্ছে; জনপ্রিয় ব্যক্তি। সবাইকার সম্মানিত, সবার উপরে সমসাময়িক বাণিজ্য ব্যাপারে অতিশয় বিশ্বাসী ক্যাপ্টেন।

অতএব···আর বাধা কি। এবার লোকটার কাছে প্রস্তাব উত্থাপন করা যাক।

লাল দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে থমসন অফিসারদের সমস্ত কথা শুনলো। আর পরিকল্পনা অনুযায়ী সমুদ্রযাত্রা করতে রাজি হয়ে গেল।

সরকারী ভল্ট ও যাজকদের সঞ্চয় গৃহ-খালি করে খচ্চর বাহিত হয়ে অগুনতি সিন্দুক ও বাক্সভর্তি মহামূল্য সম্পদাদি লিমা থেকে উপকূলবর্তী ক্যালাও বন্দরে পৌঁছলো।

সেখানে সেই বুলিয়ান, স্বর্ণের বার, জড়োয়া রত্ন সম্ভার, অলংকার ও যাবতীয় মহামূল্য দ্রব্য সামগ্রী "মেরি-ডিয়ার" জাহাজের অন্ধকার খোলের মধ্যে ভর্তি করা হল।

কিছু সংখ্যক স্প্যানিশ অফিসার উক্ত জাহাজে আরোহন করল; চার্চের পক্ষে কিছু ধর্মযাজকও গেলেন। আর গেল লিমা নগরীর রূপ যৌবনময়ী ইজ্জৎ-ভয়ে-ভীতা কালো কেশী, হরিণ নয়ন কতগুলি তরুণী-নারী।

বিদ্রোহীদের দ্বারা নিগৃহীত হওয়া বা তাদের লালসার শিকারের আতঙ্কে তারা সমুদ্রযাত্রা করলো।

ক্যাপ্টেন থমসন সকলকে অমায়িক হাসি সহ যার যার কেবিনে পৌঁছে দিয়ে যথাসময়ে জাহাজ ছেড়ে দিল। জাহাজ এগিয়ে গিয়ে নিরাপদ সমুদ্রে টইল দিয়ে ফিরতে লাগলো।

ছুদিন ছুরাত্রি কাটলো নির্বিঘ্নেই। 'মেরি-ডিয়ার' তখন দক্ষিণ সমুদ্রের উষ্ণ জলের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল।

যাত্রীরা নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন।

এদিকে নাবিকরা বোধকরি ভেতরে ভেতরে একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে। শুধু নাবিক নয় তাদের নেতা ক্যাপ্টেন সাহেবও তাই। কি একটা অব্যক্ত ব্যাপার যেন তাদের মস্তিষ্কের মধ্যে অহোরাত্র ঘুরপাক খেয়ে চলছিল, অস্থিরচিত্ততা পেয়ে বসল তাদের। কারণ কি ?

কারণ হল জাহাজের খোলের মধ্যে রাখা লিমা নগরীর অতুল বৈভব একথা বলাই বাহুল্য। যে সম্পদের কনামাত্র করে পেলেও তাদের প্রত্যেকে অবিশ্বাস্য রকম ধনী-বনে যাবে।

পায়ের নীচে ডেক। আর ডেক-এর নিচে খোল। তার মধ্যে রয়েছে···। উঃ নাবিকদের মাথা খারাপ হবার উপক্রম হল লোভে।···

···পরবর্তীকালে নগরে বন্দরে ফিরে ক্যাপ্টেন থমসন সবাইকে বলে বেড়ায় যে তার অধীনস্থ নাবিকরা নাকি তাকে বাধ্য করে তাদের মতে চলতে। বলতে গেলে সে নাকি তাদের হাতের বন্দী পুতুল হয়ে গিয়েছিল।

এটা অবশ্য জঘন্য মিথ্যা কথা। নিজের বিবেক ও জনসাধারণের রোষ এড়াতে থমসনের এটা সর্বৈব অসত্য অজুহাত।

আসল কথা, সে সময় তার অধীন প্রতিটি নাবিকের মত তাঁর নিজের মনেও নিচেকার খোলে সঞ্চিত কল্পনাতীত ধনরত্নের প্রতি অদম্য লোভ জেগে উঠেছিল।

এই অবিশ্বাস্য অকল্পনীয় ঐশ্বর্য্য দর্শনে এবং তা সব নিজ-এক্তিয়ারের মধ্যে আসায় থমসনের এতদিনকার সাধুতা নিমেষে ঝরে খসে পড়ে গেল।

সমুদ্র যাত্রার তৃতীয় দিনের গভীর রাত্রিতে সমস্ত উন্মত্ত নাবিকসহ থমসনও দরজা ভেঙ্গে যাত্রীদের কেবিনে ঢুকে পড়লো।

চুরচুরে মাতাল অবস্থায় তারা হাতিয়ারের আঘাতে সমস্ত অফিসার ও ধর্মযাজকদের হত্যা করে ফেললো।

সুন্দরী যুবতী মেয়েগুলিও বাদ গেল না।

বাঙ্কে বসে আকুলি-বিকুলি কান্না ভরা কণ্ঠে অনুনয় বিনয়কারিণী এই সব তরুণীরা মাতাল নাবিকদের হাতে নিষ্ঠুর ভাবে ধর্ষিতা হল।

অতঃপর হিংসা উন্মত্ত সেই অমানুষদের হাতে নির্মম ভাবে প্রাণ হারালো তারা।

নৌ-চালনায় দক্ষ চতুর ও অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেন থমসনের কাছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় ছোট বড় কোন দ্বীপই অজানা ছিল না। সদ্য হাতে পাওয়া লুণ্ঠিত সম্পদ কোথায় লুকিয়ে রাখা যায়. এ কথা মনে মনে ভাবতে ভাবতে একটি একটি করে দ্বীপের কথা স্মরণে এল।

অবশেষে সর্বদিক দিয়ে উপযোগী বিবেচিত হল নির্জন নিরালা মানুষের বসতিহীন দ্বীপ কোকোজ।

লিখিত ইতিহাসে তৃতীয় বারের মত কোকোজ দ্বীপের গর্ভে সঞ্চিত হয়ে গেল বিপুল সংখ্যক সোনার বার, রূপোর তৈজস, জড়োয়া তরবারি, বস্তা বস্তা স্বর্ণমুদ্রা, তাজ্জব আকারের বিভিন্ন স্বর্ণ মূর্তি (তার মধ্যে প্রমান সাইজের ভার্জিন মেরী), ক্রুশচিহ্ন ও অপরাপর হাজার রকম সামগ্রী।

"মেরি-ডিয়ার" জাহাজ নিরাপদে এসে কোকোজ আইল্যাণ্ডে পৌঁছলো।

যৎসামান্য অংশ ভাগাভাগি হবার পর লুণ্ঠিত সম্পদগুলিকে নাবিকেরা বহুকষ্ট স্বীকার করে, নিবিড় অরণ্য ও দুর্লঙ্ঘ্য ঘাসের বাধা অতিক্রম করে দ্বীপের অনেকটা দুর্গম অভ্যন্তরে বয়ে নিয়ে গেল।

তারপর, ঐতিহাসিকদের বিবরণীতে পাওয়া যায়, তারা এসে উপস্থিত হল সেই নির্জন অরণ্যের মধ্যকার একটি প্রাকৃতিক গুহার সম্মুখে।

ইতিপূর্বে এ গুহাকে খুঁড়ে বড় করা হয়েছিল কিনা সে সম্বন্ধে কিছু জানবার উপায় নেই।

তবে আশ্চর্যের কথা, ঐ সময় প্রাকৃতিক কোন অভিনব নিয়মে

বা জলদস্যুদের মধ্যেকার রাজমজুরদের সৌজন্যে এই গুহার একটি পাথরের দরজা ছিল। মজা এই যে, এর একটা চাবিও নাকি ছিল।

সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহার মধ্যে সমস্ত লুঠেরা মাল পুরে দিয়ে অবশেষে নাবিকরা জাহাজে ফিরে গিয়ে পাল তুলে দিল।

এদিকে ক্রুদ্ধ স্পেনীয়রা 'মেরা-ডিয়ার'কে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

অবশ্য খুব বেশী দিন লাগলো না। অনতিবিলম্বে ওদের পাকড়াও করল ওরা।

এবং প্রতিটি হঠাৎ গজিয়ে ওঠা বোম্বেটেদের প্রতিটি লোককে ফাঁসীকাষ্ঠে লটকে হত্যা করল।

এরপর কি হয়েছিল সে সম্পর্কে নানা বিরোধী সংবাদ পাওয়া যায়।

তবে সমস্ত সূত্রে পাওয়া সংবাদেই এটা বলা হয়েছে যে যেভাবেই হোক ক্যাপ্টেন থমসন প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায়।

পালিয়ে গিয়ে ওঠে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে এবং সেখানে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ থেকে বসবাস শুরু করে। শোনা যায় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এই কদিনের মাত্র জলদস্যু মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এবার জন কিটিং নামে একজন যুবক পাদপ্রদীপের সামনে আসে। আগে নাবিক ছিল পরে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে কৃষক হিসেবে উপরোক্ত ক্যাপ্টেন থমসনের সঙ্গে এর এক অদ্ভুত বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় বা তার কিছু আগে থমসন ওই যুবককে কোকোজ দ্বীপের গুপ্তধন রাখা স্থানের একটি মানচিত্র দেয় এবং বলে :

—সোনার প্রলোভনে "মেরী ডিয়ারের" যাত্রী সমস্ত স্পেনীয়দের হত্যা করে আমি এক নিষ্ঠুরতম কাজ করে ফেলেছিলাম, থমসন অকপটে স্বীকার করে নাকি বলেছিল কিটিং-কে, ঐ গুপ্তধন আনতে যেতে আমি সাহস করিনি। সর্বক্ষণই সেই ভয়ংকর বীভৎস

হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি আমায় তাড়া করে ফিরেছে। কিন্তু বন্ধু, তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। যাও, ওগুলো সংগ্রহ করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ধনী হয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে বসবাস করো।

কিটিং সময় নষ্ট না করে বোয়াগ নামে জনৈক নৌ-ক্যাপ্টেনের সঙ্গে পার্টনারশীপে কোকোজ দ্বীপ অভিযানের ব্যবস্থা করে।

কথিত আছে কিটিং ও বোয়াগ তুজনে কোকোজে যায়। মানচিত্র দেখে বর্ণিত পথ অনুসরণ করে গিয়ে উপস্থিত হয় সেই রত্নগর্ভ গুহাতে। এত অকল্পনীয় পরিমান সোনাদানা দেখে মাথা খারাপ হবার দাখিল হয়। শয়তানী জাগে মাথায়। একাই ভোগ করব আমি, একথা ভেবে কিটিং সহচর ক্যাপ্টেন বোয়াগকে হত্যা করে। পকেটভর্তি কিছু সোনাদানা নিয়ে জাহাজে ফিরে এসে নাবিকদের জানায়, বোয়াগ নৌকো থেকে সমুদ্রে পড়ে গিয়ে তলিয়ে গেছে।

নাবিদের বিশ্বাস হয়নি একথা। দেশে ফিরে হত্যাপরাধে যদিও তার বিচার হয় কিন্তু প্রমাণাভাবে সে মুক্তি পায়। অবশ্য দ্বিতীয়-বার সে কোকোজ দ্বীপে যেতে সমর্থ হয়নি।

মোটামুটি ইতিহাস এই।

ঐ অভিশপ্ত ডাইনী দ্বীপে ডেভিসের সাড়ে সাতকোটি, গ্রাহামের সাড়ে বারোকোটি এবং থমসনের তিরিশ কোটি এই যোগ করে প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকার ধনরত্ন সোনাদানা সঞ্চিত হয়ে রয়েছে।

শত শত লোক ঐ দ্বীপে নানাভাবে গুপ্তধন উদ্ধারে গেছে আজও পর্যন্ত কেউ কিছু পায়নি। মাঝখান থেকে রোগে শোকে হতাশায় মৃত্যুতে সবাই নাজেহাল হয়ে ফিরেছে।

ঐ গুপ্তধন কেউ যদি পায় তো চুক্তি অনুসারে কোস্টারিকা সরকারকে দিতে হবে এক তৃতীয়াংশ, তার উপর আছে ইনকাম ট্যাকস। তা সত্বেও বাদবাকি যা থাকবে তা ভোগ করতে তিন চৌদ্দং বিয়াল্লিশ পুরুষ লেগে যাবে।

সাত

যে অঞ্চল থেকে জাহাজটি ছেড়েছিল সে বড় ভয়াবহ অঞ্চল।

অঞ্চলের নাম: টাসমানিয়ার পেনাল কলোনী। এটি বিগত শতাব্দীতে একটি বিশালকায় অপরাধীদের উপনিবেশ ছিল। ইংল্যাণ্ডের কুখ্যাত ক্রিমিনালদের দ্বীপান্তর করে এখানে নির্বাসিত করা হত।

সেখান থেকেই ছেড়েছিল 'ম্যাডাগাস্কার' জাহাজ। এই ব্রিটিশ জাহাজ ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট অস্ট্রেলিয়ার পোর্ট ফিলিপ বন্দর থেকে লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করেছিল। কিছু যাত্রী আর বেশীর ভাগই মাল।

কি পণ্য নিয়ে সে রওনা দিয়েছিল? পণ্যদ্রব্যাদির প্রধান ছিল সোনা।

সে জাহাজ কিনা গভীর সমুদ্রের কোন একস্থান থেকে অকস্মাৎ নিরুদ্দিষ্ট হয়ে গেল। চরম রহস্যময় ভাবে এ পৃথিবী থেকে একেবারে বেপাত্তা হয়ে গেল।

শুধু জাহাজ কোম্পানীই নয়, ব্রিটিশ সরকারও সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হল। জাহাজটিতে স্বর্ণধুলি ও সোনার বাট মিলিয়ে ছয় থেকে সাতশ পাউণ্ড মাল ছিল। কল্পনা করুন কি আজগুবী মূল্যের সে স্বর্ণ সামগ্রী।

জাহাজ যখন যাত্রা করে আকাশে ছিল না এতটুকু মেঘ, বাতাসে ছিল না ঝড়ের চিহ্নমাত্র, সমুদ্র ছিল শান্ত শীতল। তবে কি হল জাহাজটির?

জাহাজ নেই। কেউ কোন সংবাদ জানে না। এক বছর দুবছর করে পুরো সাত বছর কেটে গেল। না সেই জাহাজের, না বা কোন

যাত্রী, নাবিক, মাল্লা কারুরই কোন সন্ধান বা সংবাদ পাওয়া গেল না।

তারপর। ঠিক সাত বছর বাদে এক অদ্ভুত সূত্র থেকে এল প্রথম সংবাদ। সে সংবাদ যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি ভয়াবহ।

দূর প্রাচ্যের ফিজিদ্বীপস্থ সুভা নামক স্থানে এক ছোট মিশনারী হাসপাতালে মরনোন্মুখ এক রোগিণী বলে উঠল 'ম্যাডাগাস্কার' জাহাজের দুর্ঘটনার সময় সে সেই জাহাজের একজন যাত্রিণী ছিল: কি হয়েছিল কি ঘটেছিল সে সব জানে।

উক্ত হাসপাতালের ফাদারের কাছে মেরি কলিন্স নাম্নী সেই মেয়েটি সব কিছু বলে যায়।

ঘটনাটি নিম্নরূপ :

ম্যাডাগাস্কার জাহাজে অস্ট্রেলিয়া থেকে একজন ধনাঢ্য অথচ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত ভদ্রমহিলা ইংল্যাণ্ড ফিরে যাচ্ছিলেন। মেরী তাঁর নার্স হিসেবে সঙ্গে যাচ্ছিল।

যাত্রার দিন আবহাওয়া ছিল অতি মনোরম। রোদ ঝকঝকে উজ্জ্বল দিন। জাহাজে মাল ওঠানামার বিচিত্র শব্দ, যাত্রীদের কলরব, স্নিগ্ধ নোনাবাতাস বইছিল সাগর থেকে।

তবু নাকি জাহাজটির মধ্যে অব্যক্ত আতঙ্কের এক অশুভ ছায়া নেমে এসেছিল। সমস্ত জাহাজে অদ্ভুত এক অন্তিম করাল ভয় ভীতির কালো ছায়া যেন পাখা মেলে প্রচ্ছন্ন ভাবে গ্রাস করেছিল।

যাত্রীদের প্রথম দলে যারা ছিল তারা হ'ল খনি থেকে তুলে আনা সোনার বস্তাসহ খনিকর্মীর দল। ওরা স্বদেশ ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাচ্ছিল। সোনার যাবতীয় বস্তা গুলি এক একটি ওক কাঠের কতকগুলি সিন্দুক জাতীয় বাক্সে ভরে জাহাজের খোলে সযত্নে রাখা হয়েছিল।

সোনা। এ বড় সাংঘাতিক ধাতু। এর প্রলোভন বুঝি দুর্দমনীয়।

যে ভাবেই হোক এই মহামূল্য ধনরত্নর কথা চারিদিকে রটে গিয়েছিল। ম্যাডাগাস্কার ছাড়ছে এবং এই জাহাজে প্রচুর পরিমান সোনা যাচ্ছে। মধু যেমন মৌমাছিদের টানে। সোনাও বুঝি টানলো খুনে ডাকাতদের।

দ্বিতীয় দলে যে সব যাত্রীরা এল তাদের প্রথম দর্শনেই মনে হবে অবধারিত দুষ্ট প্রকৃতির লোক তারা। জংলা দেশ থেকে আসা হিংস্র-দৃষ্টি সম্পন্ন নিষ্ঠুর অপরাধীর দল এরা।

কিছুক্ষণ বাদে মেলবোর্ন থেকে আগত কয়েকজন ডিটেকটিভ উঠে এল জাহাজে।

তারা সন্ধানী চোখ নিয়ে সমস্ত জাহাজ ঘুরে কি সব যেন দেখলো। অতঃপর ডাকাতি করায় পূর্বতন অপরাধে উক্ত যাত্রীদের দু'জনকে ধরে গ্রেপ্তার করে জাহাজ থেকে নামিয়ে নিয়ে গেল।

এই সব কারণে জাহাজ ছাড়তে নির্দিষ্ট সময় থেকে প্রায় মাসাধিক কাল দেরী হয়ে গেল।

কারণ উক্ত দু'জন অভিযুক্ত মানুষের বিচার হল। পরে প্রমাণাভাবে তারা মুক্তি পেয়ে যতদিন না জাহাজে ফিরে এল ততদিন জাহাজে পাল তোলা সম্ভব হল না।

অবশেষে এক শুভক্ষণে বলা যাবে না, অশুভ ক্ষণেই ম্যাডাগাস্কার জাহাজ পোর্টফিলিপ বন্দর ছেড়ে ইংলণ্ডের পথে যাত্রা করলো।

প্রথমটা যে আতঙ্কের ছায়া গ্রাস করে ফেলেছিল সারা জাহাজকে, খোলা সমুদ্রের উত্তাপ হাওয়ার দাপটে বুঝি তা অপসারিত হয়ে যাত্রী সাধারণের মধ্যে আনন্দের ঢেউ তুলে দিল। উল্লসিত যাত্রীদল নাচ গান হৈ হল্লায় মেতে সুখকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে তুললো।

কিন্তু হায় এই আনন্দ যাত্রীদের কপালে বেশীক্ষণের জন্য লেখা ছিল না।

পোর্ট ফিলিপও যেমনি দিগন্ত রেখায় মিলিয়ে গেল অমনি এই অভিশপ্ত জাহাজে দেখা দিল বিদ্রোহের আগুন।

আর এ বিদ্রোহের নেতৃত্ব নিতে দেখা গেল সেই যে ডাকাতির দায়ে অভিযুক্ত পরে খালাস পাওয়া সেই হিংস্রদৃষ্টি সম্পন্ন কদাকার দুই ব্যক্তিকে।

শুরু হয়ে গেল নরক যন্ত্রনা। চতুর্দিকে উঠলো আর্ত ভয়ার্ত চীৎকার। ভীত সন্ত্রস্ত যাত্রীদের মধ্যে ডেকে এসে হুড়োহুড়ি আরম্ভ হয়ে গেল।

ঘটনার শুরু শেষরাতে। উপরে গোলমাল, চেঁচামেচি, দাপাদাপীর শব্দে নিচে কেবিনে শোওয়া মেরীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। জেগে উঠে যা দেখলো, যা শুনলো তাতে রক্ত জল হয়ে গেল।

সেই মুহূর্ত থেকে শুরু হল সকল যাত্রীদের অসহনীয় দুঃখ কষ্ট অত্যাচার ও ভয়ংকর মৃত্যুভরা দিন ও রাত্রি। মেরী প্রথমটা ভাবল এটা ঘুম, এবং ঘুমের মধ্যেকার কোন বীভৎস দুঃস্বপ্ন। ঘুম ভাঙলেই এ ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন ভেঙে যাবে আর সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে। কিন্তু তা হল না। কেননা এতো স্বপ্ন নয়। এযে কঠোর অসহ্য বাস্তব।

মেরি যাত্রীদের উপরের ডেক-এ বিকট আর্তরব ও দৌড়োদৌড়ি ছুটোপাটির ভয়াবহ আওয়াজ শুনে দ্রুত পোষাক পালটে ব্যাপার দেখতে উপরে উঠে এল।

যা দেখলো, যে দৃশ্য চোখে পড়লো তাতে ভয়ে আতঙ্কে মেরীর সারা দেহে যেন রক্ত জমে এল।

সেই অপরাধী খুনে গুণ্ডারা জাহাজের কর্তৃত্ব দখল করে নিয়েছে। যে সব নাবিক এই অপকর্মে বাধা দিতে এসেছিল তাদের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন রক্তাক্ত দেহগুলি ডেকের পাটাতনের উপর গড়াগড়ি খাচ্ছে। আর আহতের সংখ্যাও ততোধিক। যন্ত্রণায় অনেকেই ছটফট করছে, কিছু বুঝি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছে মৃতবৎ।

মেরী ভীতি বিহ্বল নেত্রে এই অকথ্য অত্যাচার দেখছিল, এমন

সময় সেখানে এসে উপস্থিত হল জাহাজের ক্যাপ্টেন হ্যারিস। ব্যাপার স্যাপার দেখে ক্রোধে তার চক্ষু রক্তবর্ণ আর দেহ কাঁপছে থরথরিয়ে।

কাণ ফাটা হুঙ্কার ও হত্যাধ্বনি দিয়ে খুনেরা রেরে করে ধেয়ে গেল ক্যাপ্টেনকে আক্রমনের উদ্দেশ্যে। বিশাল একটা কাঠ দিয়ে এলোপাথারি আঘাত হানতে লাগলো ক্যাপ্টেনের বুকে মুখে মাথায়।

ক্যাপ্টেন হ্যারিসের আকৃতিও বিশালকায় অতিমানব সদৃশ। সবার ওপরে সে অতীব বেপরোয়া দুঃসাহসী মানুষ। ক্যাপ্টেন প্রচণ্ড ঘুষির পর ঘুষি চালিয়ে কয়েকজন খুনেকে চোখের নিমেষে ধরাশায়ী করে ফেললো।

তারপর রক্তাক্ত কলেবর নিয়ে ছুটলো নিজ কেবিনের উদ্দেশ্যে। বন্দুক আনবার জন্যে। বন্দুক নিয়ে আসতে পারলে কি হত বলা যায় না।

কিন্তু সে সুযোগ ক্যাপ্টেন পেল না। কেবিন পর্যন্ত যাবার আগেই বিদ্রোহী শয়তানেরা লগুড়াঘাতে তাকে অচেতন করে ফেললো তারপর রক্তাক্ত বিশাল দেহটাকে ক'জনে মিলে চ্যাংদোলা করে রেলিং টপকে সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করলো।

অবশ হয়ে যাওয়া কম্পিত দেহ নিয়ে মেরী দেখলো নোনা জলের প্রভাবেই বুঝি ক্যাপ্টেনের জ্ঞান ফিরে এল। সে সাঁতার কেটে কেটে এগিয়ে এসে জাহাজের একটা দড়ি ধরে ফেলল তারপর প্রাণপণ চেষ্টায় দড়ি বেয়ে উপরে উঠবার চেষ্টা করল।

কিন্তু হায়। সেই মুহূর্তে বিদ্রোহী শয়তানদের একজন একটা কুঠার দিয়ে এক কোপে ওপর থেকে দঁড়িটাকে কেটে দিল, ঝপাং শব্দে পুনরায় ক্যাপ্টেন হ্যারিস জলে পড়ে গেল।

কয়েকবার মাত্র তার হাত পা ও মাথা বাঁচবার চেষ্টায় ভেসে উঠলো সফেন সমুদ্র জলের উপর। কতক্ষণ যুঝবে, রক্তমোক্ষণ হয়ে

শরীর অবশ। একসময় সর্বতাপ ও বেদনাহারিণী সর্বংসহা সমুদ্র তাকে চিরদিনের মত বুকে টেনে নিল।

জাহাজ হয়ে গেল অনাথ। ম্যাডাগাস্কার জাহাজ এখন পুরোপুরি গুণ্ডা বোম্বেটের হাতে চলে গেল।

তারা দায়িত্বশীল সমস্ত অফিসারকে নীচে থেকে টেনে হিঁচড়ে ডেকের উপর নিয়ে এল। তারপর তাদেরও সেই ক্যাপ্টেনের প্রক্রিয়ায়ই আধমরা করে রেলিং টপকে সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হল। প্রহারে জর্জরিত নিদারুণ আহত দেহগুলির সমুদ্র-সমাধি হয়ে গেল।

মেরী এবং অপরাপর মেয়েরা আতঙ্কে আধমরা হয়ে চলৎশক্তি রহিত অবস্থায় যে যেখানে ছিল স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইল। না পারল নড়তে, না পারল কোন প্রকার আর্তচিৎকার করতে। শুধু তাদের মনের মধ্যে এই প্রশ্নটাই চকির মত পাক খেতে লাগলো, না জানি এর পর ওদের কি দশা করে অমানুষ জানোয়ারেরা।

বেশীক্ষণ অবশ্য ওদের উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করতে হল না এরপর।

যাত্রীদের দুই ভাগে ভাগ করা হল প্রথমে।

পুরুষ ও বৃদ্ধা রমণীদের ধরে নিয়ে গিয়ে নিচে খোলের মধ্যে বন্দী করে রাখা হল। আর মেরী প্রমুখ অপরাপর যুবতী রূপসী মেয়েদের নিয়ে যাওয়া হল বড় একটা কেবিনের ভেতর।

ওপরের ডেকে তখন পিঁপে থেকে মদ ঢালবার শব্দ হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মত্তমাতালদের উন্মত্ত চীৎকারধ্বনি, বিকট অট্টহাসি শোনা গেল।

নিচে কেবিনের মধ্যে মেয়েগুলি থরথর করে কাঁপতে লাগলো এই ভেবে যে তাদের কি ভয়াবহ পরিণতি হবে এই মদ মাতাল কামুক শয়তানদের হাতে।

অবশেষে নেমে এল খুনে গুণ্ডা বেহেড মাতালের দল। সমবেত চীৎকার করে উঠল যুবতী মেয়ে বন্দীরা।

কোন প্রকার দয়া করুণা কৃপা এদের কাছে আশা করা বাতুলতা মাত্র। ওরা তখন প্রত্যেকে পশুতে পরিণত হয়েছে। এতদিনকার নারী-সঙ্গবিহীনতা ওদের লালসাকে শতগুণে বাড়িয়ে তুলেছে।

তারপর সেই দলবদ্ধ নেকড়ের পাল চূড়ান্ত সুরামত্ত অবস্থায় নেমে এল মেয়েগুলোকে বুঝি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে খেতে···

মেরীর পানে যে এগিয়ে এল সে একটি মার্কণ্ড দৈত্য বিশেষ। মেরী চোখ বুজে ফেললো আতঙ্কে। চীৎকার দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু কণ্ঠ দিয়ে কোন আওয়াজ বের হল না, লৌহ ভীমের মত বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলো মেরীকে সেই দৈত্য।

এই শুরু। এরপর দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি এইভাবে কেটেছে। কামনা-পঙ্কিল নারকীয় দিনরাত্রি। দুঃস্বপ্নও বোধ করি এত ভীষণতম হয় না। কল্পনাতীত বেদনাময় তিক্ত অভিজ্ঞতা। এর চেয়ে বুঝি সমুদ্রজলে নিক্ষিপ্ত হয়ে মৃত্যু ছিল শ্রেয়।

কিন্তু মরতে ওরা দেয়নি। কতকগুলি উন্মত্ত কামপ্রবণ পশুর হাতে বন্দিনী হয়ে রইল মেষ শাবক সদৃশা রূপবতী কতগুলি যুবতী মেয়ে।

বিদ্রোহ সফল হয়েছে। খুনে বোম্বেটেরা যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছে। খুবই উল্লসিত তারা।

কথাবার্তায় আলোচনায় মেরী শুনতে পেল ম্যাডাগাস্কার জাহাজের গতি তারা রিও ডি জেনেরোর দিকে ফিরিয়েছে। উদ্দেশ্য হল, সেখানে গিয়ে সোনাদানার বস্তাগুলি নামিয়ে নিয়ে, ঐ পোড়া জাহাজটাকে ধ্বংস করে কেটে পড়বে।

কল্পনাতীত ধনী বনে বাকী জীবন তারা স্বচ্ছলতায় কাটাবে। শুধু নিজের জীবন নয় অধস্তন চৌদ্দ পুরুষ বসে খেলেও অর্থের অভাব হবে না।

আবহাওয়া অনুকূল, চমৎকার বাতাস। জাহাজ চালনার কোন অসুবিধে হল না। ফুলে ফেঁপে ওঠা পালগুলির ধাক্কায় ম্যাডাগাস্কার

জাহাজ শোঁ শোঁ গতিতে এগিয়ে চললো অন্তরীপ ঘুরে দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল বরাবর।

কিন্তু ব্রাজিলের কাছাকাছি আসতেই শান্ত সমুদ্র নিল প্রলয়রূপ। সহসা সমুদ্রে উঠল প্রবল ঝড় তুফান।

ম্যাডাগাস্কারকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও, ইচ্ছার বিরুদ্ধেই প্রচণ্ড গতিতে তীরের দিকে ঠেলে নিয়ে চলল।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলল ঝড়। তারপর ঝড় থামল। কিন্তু বিশালকায় পর্বতপ্রমাণ ঢেউয়ের ধাক্কায় উথালি পাথালি হতে হতে জাহাজ চললো তীরভূমির দিকে।

প্রচণ্ড কুয়াশা ভরা রাত্রি এল। কিছুই দৃষ্টি গোচর হয় না। ডেকের ওপর দু'হাত তফাতে লোক চেনা যায় না এমন কুয়াশা।

জাহাজ চলছে। সহসা ভয়ংকর এক ঝাঁকুনি লাগলো জাহাজে। বোঝা গেল জলের তলায় কোন গুপ্ত পাহাড়ে ধাক্কা খেয়েছে জাহাজ। সেই প্রবল ঝাঁকুনিতে গোটা দুই মাস্তুল মড় মড় করে ভেঙে পড়ে গেল। সারা জাহাজ কাঁপতে লাগলো থর থর করে।

সঙ্গে সঙ্গে নাবিকেরা ডেক-এ এবং জাহাজের সামনের দিকে কতগুলো তীব্রজ্যোতি লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিল।

বিপদের ওপর বিপদ।

পরক্ষণে পুনরায় শুরু হল প্রলয়ংকর তুফান। সে তুফানের তুলনা নেই। সমস্ত মাস্তুল ভেঙে পড়ল। ডেকের উপর পাল চাপাপড়া আর্ত মানুষের করুণ চীৎকার ও আর্তনাদে যেন তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল।

অসহ্য সে রাত ও এক সময় কেটে গেল।

সকালে দুটো লাইফ বোট নামানো হল সমুদ্রে।

বিদ্রোহী বোম্বেটেরা কয়েকটি বাছাই করা যুবতীকে তুলে নিল তাতে।

আর নিল বিক্ষুব্ধ উত্তাল সমুদ্রে ছোট নৌকায় যতটা নেওয়া সম্ভব ততটা স্বর্ণধুলি ও স্বর্ণবাটের বস্তা।

নৌকা ছাড়বার অব্যবহিত পূর্বে নৃশংস সেই বোম্বেটেরা জাহাজের বিভিন্ন স্থানে তেলে চোবানো ন্যাকড়া ছড়িয়ে ছড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিল।

মেরী সেই চলন্ত লাইফ বোটে বোম্বেটেদের আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় বসে বসে এক লোমহর্ষক দৃশ্য দেখতে দেখতে শিউরে উঠতে লাগলো।

দেখতে দেখতে সারা জাহাজটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। আর ডেকের নিচে খোলের মধ্যে বন্দী থাকা অসহায় মানুষগুলি দগ্ধ হতে হতে মরণ চীৎকারে নিঃসীম সমুদ্র বাতাসকে মথিত করে শিহরিত করে তুলছে।

মেরী দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল। বীভৎস দৃশ্য, মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। ঐ সর্বধ্বংসকারী অগ্নির মধ্যে জীবন্ত দগ্ধ হওয়া থেকে বেঁচে গেছে এই সান্ত্বনা মনের মধ্যে উদিত হতে না হতে এক পর্বত-প্রমাণ বেয়াড়া ঢেউয়ের ধাক্কায় দু দুটি লাইফ বোট উলটে গেল সাগর জলে।

সবাই জলে পড়ে গেল। হায় এত সাধের সেই সোনার বস্তাগুলি, যার জন্যে, যার লোভে এই অপকর্ম, অপঘাত, নরহত্যার তাণ্ডব, সেগুলিও নিমেষে সমুদ্র গর্ভে তলিয়ে গেল।

নিয়তির নির্মম পরিহাস। বোম্বেটে শয়তানদের কপালে প্রকৃতই দুঃখ আছে, খণ্ডাবে কে।

সেই পর্বত প্রমাণ ঢেউ এ আছাড়ি বিছাড়ি খেতে খেতে মেরি কলিন্স সহ ক'জন ঠিকই তীরে গিয়ে পৌঁছলো নাকানি চুবানি খেতে খেতে।

পৌঁছলো বটে তবে চরম সর্বহারা নিঃস্ব অবস্থায়। সোনা দানা গেছে, খাবার দাবার গেছে সঙ্গের অস্ত্রশস্ত্রও খুইয়েছে বোম্বেটেরা।

অদ্ভুত অসহায় অবস্থা।

ছয়জন পুরুষ ও পাঁচজন নারী ছিন্ন ভিন্ন ও সিক্ত পোষাকে তীরে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডায় কাঁপছে।

সামনে যতদূর দৃষ্টি চলে অন্তহীন আর দুর্গম ব্রেজিলের অরণ্যভূমি।

অনন্যোপায়। দ্বিতীয় কোন উপায় নেই। মরিয়া হয়ে সকলে উত্তর দিক বরাবর রিওডিজেনেরোর পথে হাঁটা শুরু করল এগারজন নরনারী, ক্লান্ত ক্ষুধার্ত অসহায়।

গম্ভীর অরণ্য ঘিরে এল চতুর্দিকে। শ্বাপদসংকুল বিষাক্ত আবহাওয়া ঘেরা কালান্তক ভয়াবহ অরণ্য।

খাদ্যহীন পানীয়হীন দলটি ধুকতে ধুকতে চলতে লাগলো।

বহুদূর পথ হেঁটে অবশেষে রেড ইণ্ডিয়ানদের এক গ্রাম পাওয়া গেল সেখানে কিছু খাদ্য পানীয় না পেলে হয়ত এদের সবারই বেঘোরে মৃত্যু হ'ত।

কিন্তু এরপর এল শাস্তি স্বরূপ আরও বড় বিপদ।

স্থানীয় কালান্তক এক জ্বরের মহামারীতে পড়ে এই দলের প্রায় সবারই মৃত্যু হ'ল।

বেঁচে রইল শুধু বোম্বেটে দলের নিষ্ঠুর হিংস্র দুই নেতা আর হতভাগিনী মেয়ে মেরি কলিন্স।

এরপর ওরা কত গ্রাম কত পথ এবং কতদিন ধরে যে পথ চলতে লাগল তার আর লেখাজোখা নেই। দিনে পথ হাঁটা রাত্রিতে অত্যাচার। মেরীর অবস্থা অবর্ণনীয়।

মরতে চেয়েছে, মরতে পারেনি। মরতে তাকে দেয়নি নিজেদের জৈবিক প্রয়োজনে। একবার বোম্বোটে দুজনের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য পালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়ল মেরী। ফলে দুজন বোম্বেটে মিলে বেদম প্রহার করল ওকে। আর পালাবার চেষ্টা করেনি সে।

অতি শোকে পাথর বনে গিয়ে ওদের সঙ্গে সঙ্গে সে পথ চলতে লাগলো।

অবশেষে বহু, বহু দিন পরে, কত মাস কে জানে, ওরা এসে রিওডিজেনেরোতে পৌছলো।

মেরী বুঝি এবার ওদের হাত থেকে মুক্তি পেল। বোম্বেটে দুজন ওকে একা ফেলে কোথায় কেটে গেল কে জানে।

দেহ মন সব কলঙ্কিত, বিধ্বস্ত মেরী কলিন্সের বয়েস যেন এ কদিনে বেড়ে গেছে দশ বছর।

বন্দরের তীরে তীরে বহুদিন জাহাজের প্রতীক্ষায় রইল মেরী। কিন্তু কোন জাহাজই ওকে নিল না।

অবশেষে বহু চেষ্টার পর এক দয়াবান ক্যাপ্টেন অনুগ্রহ করে ওকে ফিজি দ্বীপের এই সুভাতে পৌছে দিয়ে যায়।

এই মেরীর মুখেই জানা যায় যে ম্যাডাগাস্কার জাহাজ তার সোনাদানা নিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ডুবে গেছে সাও পাওলোর একশ মাইল দক্ষিণে পারাঙ্গুয়া নামক উপসাগরে।

চেষ্টা করলে সেই সোনাদানা হয়ত কেউ এখনো উদ্ধার করতে পারে।

এই কথা বলে বেচারা মেরী কলিন্স সেই সুভাস্থ মিশনারী হাসপাতালে ফাদারের আশীর্বাদ সহ পরলোক গমন করে।

সমাপ্ত